বিধবার জীবন যজ্ঞ

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

- নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ-
- ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ -

অযাচক আশ্রম

রহিমপুর,ডাকঃ-মুরাদনগর,জেলাঃ-কুমিল্লা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

অমূল্য গ্রন্থাবলী

১. সরল ব্রহ্মচর্য্য
২. অসংযমের মূলোচ্ছেদ
৩. জীবনের প্রথম প্রভাত
৪. আদর্শ ছাত্র-জীবন
৫. আত্ম-গঠন
৬. সংযম-সাধনা
৭. দিনলিপি
৮. স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব
৯. প্রবুদ্ধ যৌবন
১০. কুমারীর পবিত্রতা (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)
১১. নবযুগের নারী
১২. গুরু
১৩. অখণ্ড-সংহিতা (১ম-২৪শ খণ্ড)
১৪. মন্দির (গানের বই)
১৫. মূর্চ্ছনা (গানের বই)
১৬. মঙ্গল মুরলী (গানের বই)
১৭. মধুমল্লার (গানের বই)
১৮. সমবেত উপাসনা
১৯. His Holy Words
২০. নববর্ষের বাণী
২১. বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য
২২. বিবাহিতের জীবন-সাধনা
২৩. সধবার সংযম
২৪. বিধবার জীবন-যজ্ঞ
২৫. কর্ম্মের পথে
২৬. কর্ম্মভেরী
২৭. আপনার জন
২৮. পথের সাথী
২৯. পথের সন্ধান
৩০. পথের সঞ্চয়
৩১. ধৃতং প্রেম্না (১ম-৩৮শ খণ্ড)
৩২. বন-পাহাড়ের চিঠি (১ম-২য় খণ্ড)
৩৩. শান্তির বারতা (১ম-৩য় খণ্ড)
৩৪. সাধন পথে
৩৫. সর্পাঘাতের চিকিৎসা
৩৬. আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা
৩৭. সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ

স্বরূপানন্দ সাহিত্য পাঠ করুন - আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা নিন।

অযাচক আশ্রম, রহিমপুর, ডাক - মুরাদনগর, কুমিল্লা - ৩৫৪০, হইতে প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

আমার জ্ঞানদাতা গুরু ও ব্রহ্মদাতা পিতা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বাংলা ১৩৩৪ সালে কতিপয় ভক্তিমতী বিধবা ধর্ম্মকন্যার নিকটে যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন, "বিধবার জীবন-যজ্ঞ" তাহারই সমষ্টি হইলেও এই গ্রন্থ একমাত্র বিধবাদেরই জীবন-গঠনে ও চরিত্র-সাধনায় সহায়তা করিয়াছে, তাহা নহে। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ হইতে অনেক কুমারী এবং অনেক সধবা নিজ নিজ জীবনে সংযম ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠায় পরিপূর্ণ সহায়তা আহরণ করিয়াছেন। কারণ, সধবা ও কুমারী রমণীগণেরও পক্ষে এই গ্রন্থে শত শত মঙ্গলজনক উপদেশ রহিয়াছে। "বিধবা" শব্দটী দেখিয়াই যেন আমাদের কুমারী ও সধবা ভগ্নীরা ভয় পাইয়া না যান। নারীর পবিত্রতার শত্রু কাহারা আর বন্ধু কাহারা, নারীর পবিত্রতাচ্যুতির প্রধান কারণ কি এবং তাহার প্রতিকারই বা কি, মনের উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্ব্বলতা ও কামমোহ কি ভাবে বিদূরণ করিতে হইবে প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের অভ্রান্ত ও মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ ইহাতে রহিয়াছে।

প্রথম সংস্করণের "নিবেদনে" আমরা শ্রীশ্রীবাবার অপ্রকাশিত পত্রাবলি হইতে কয়েকটি বাণী উদ্ধার করিয়াছিলাম। এই দ্বিতীয় সংস্করণেও তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল।

(১)

"পুরুষজাতির সঙ্গে সঙ্গে যদি নারীজাতিও শক্তিশালিনী না হন, নারীরও যদি বাহুতে বল, বুকে সাহস, মস্তিষ্কে বুদ্ধি ও প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা স্ফুরিত না হয়, তাহা হইলে একাকী পুরুষজাতি এই অধঃপতিত ভারতবর্ষকে আর কতখানি ঠেলিয়া তুলিতে পারিবে ? এক পা যাহার খোঁড়া, কতকাল সে দীর্ঘপথ চলিতে পারে ? একটি ডানা যাহার ভগ্ন, গগনমণ্ডলে সে পাখী ঝড়-ঝঞ্ঝার ঝাপ্‌টা সহিয়া কতক্ষণ আর স্বাধীনভাবে সঞ্চরণ করিতে পারে ? ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছে,—দেখিবার তাহার অধিকার আছে। কিন্তু এই স্বপ্ন কি কখনও

সফল হইবে, যদি পুরুষের চেষ্টার পশ্চাতে না থাকে নারীর হৃদয়, পতির সাধনার পশ্চাতে না থাকে পত্নীর সাহচর্য্য, ভ্রাতার উদ্যমের পশ্চাতে না থাকে ভগ্নীর সহায়তা, পিতার যত্নের পশ্চাতে না থাকে কন্যার উৎসাহ, আর পুত্রের অধ্যবসায়ের পশ্চাতে না থাকে মাতার দিব্য অভয় ?”

(অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত)

(২)

“যাঁহাদিগকে আমরা সংসারের আবর্জ্জনা বলিয়া মনে করিতেছি, যাঁহাদিগের উপরে অত্যাচার ও উৎপীড়নের চূড়ান্ত বোঝা চাপাইয়াও আমরা নির্লজ্জের মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছি, সেই নিঃসন্তানা বাল-বিধবাদের মধ্য হইতে হয়ত ভবিষ্যৎ ভারতের লক্ষ লক্ষ শক্তিশালিনী দেশনেত্রীর আবির্ভাব ঘটিবে। ইহাদেরই জীবনের মধ্য দিয়া সংখ্যাতীত কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীরের জ্বলন্ত প্রতিভা ফুটিয়া উঠিবে। ইঁহাদের উন্নতির জন্য কিছুই আমরা করি নাই কিন্তু আমাদের জন্য ইঁহারা সব করিবেন,—বুকের রক্ত ঢালিবেন, প্রাণ দিবেন। হুজুগে পড়িয়া আমরা পুরুষের জাতি ইঁহাদের প্রতি ক্কচিৎকদাচিৎ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছি, অনাথ-সদন বা বিধবা-আশ্রম খুলিয়াছি এবং ইঁহাদের মনুষ্যত্ব অথবা ব্যক্তিত্বের প্রস্ফুটনের দিকে লক্ষ্য মাত্র না রাখিয়া দেশমধ্যে নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিমিত্তমাত্র রূপে বিধবা পালন করিয়াছি। ফল হইয়াছে কি ? না,—তপঃসাধনহীন প্রতিষ্ঠানের ভিতরে গুপ্ত পাপ প্রবেশ করিয়া সব ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে,—আশ্রম-নামধেয় জেলখানা বা কারখানাগুলিকে চরিত্রবতী মহিলাদের পক্ষে নরককুণ্ডের ন্যায় অসহনীয় ও ভীতিসঙ্কুল করিয়াছে। নরককুণ্ড হইত না, মায়েরা যদি নিজেরা এইগুলি গড়িতেন এবং পরিচালনা করিতেন, আর, নিজেদের জীবনগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেন—অকপট ধর্ম্ম-সাধনার উপরে, ব্রহ্মানুভূতির সুনির্ম্মল প্রীতি ও চিত্তশুদ্ধির যথার্থ অনুভূতির উপরে।”

(অপ্রকাশিত পত্র হইতে উদ্ধৃত)

(৩)

"বিধবার জীবন-সাধনা ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণের মধ্য দিয়া নহে, ধর্ম্মের দোহাই চালাইয়া ভোগ-চর্চ্চার মধ্য দিয়া নহে, সহজ-সাধনার নাম করিয়া গোপন ব্যভিচারের মধ্য দিয়া নহে, বৈষ্ণবীয় পরকীয়া-প্রীতির উদাহরণে ঘোর দুর্নীতির পূতিগন্ধের মধ্যে নহে, পরন্তু পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সন্তানবোধে সমগ্র মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতিই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"

(অপ্রকাশিত পত্র হইতে উদ্ধৃত)

সমুদ্র-বায়ুর ন্যায় আয়ুঃপ্রদ ও পবিত্রতা-বর্দ্ধক এই অমূল্য গ্রন্থ বাংলার প্রত্যেক কুমারী, সধবা ও বিধবার জীবন নির্ম্মল করুক। ইতি—

আশ্বিন, ১৩৪৬

অযাচক আশ্রম
পুপুন্‌কী, চাষ, মানভূম।

নিবেদিকা—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

দীর্ঘকাল পরে হইলেও "বিধবার জীবন-যজ্ঞের" পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হইল দেখিয়া আনন্দিত মনে শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণের তাগিদ-পত্রে এই কয় বৎসর বড়ই কুণ্ঠায় দিন কাটিয়াছে। আশা করি পূর্ব্ববর্ত্তী চারি সংস্করণের ন্যায় এই পঞ্চম সংস্করণও সমাদৃত হইবে। বলা বাহুল্য যে, বাংলা-সাহিত্যের এই একটী নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে "বিধবার জীবন-যজ্ঞে"র অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী আজ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হয় নাই। "বিধবার জীবন-যজ্ঞ" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় মাঘ, ১৩৮৫ সনে। দীর্ঘ ৯ বৎসর পর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইতি—ভাদ্র, ১৩৯৩

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী-২২১০১০

নিবেদিকা
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

বাংলাদেশ প্রথম সংস্করণের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব এক অভ্যুন্নত মানব জাতির অভ্যুদয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারকে এক একটি উন্নত আধুনিক গবেষণাগারের মত পরিকল্পনা করিয়া সংযম সুরভিত এক দিব্য জীবন গঠন প্রণালীর রূপ-রেখা চিহ্নিত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ মানুষের জীবনকে ঈশ্বরমুখী করা এবং জীবনকে সার্থক করিবার জন্য সংযমের সাধনাকে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে দৃঢ়ভাবে অনুশীলনের উপরেই অভ্যুন্নত মানব জাতি সৃষ্টির মূল রহস্য নিহিত।

এ যাবৎ পৃথিবীতে এ জাতীয় অভিনব পরিকল্পনা এবং ব্যাপক ব্যবহারিক পদক্ষেপ কোন মহামানব গ্রহণ করেন নাই।

মানব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে, বয়সের প্রতিটি অধ্যায়ে, মানসিক গতি-প্রকৃতির তারতম্যের সাথে সাথে জ্যান্তব প্রকৃতির তাড়না অবধারিত। কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, বিবাহিত, অবিবাহিত, বিপত্নীক বা বিধবা এগুলির যে কোন একটি অবস্থা নিয়েই মানব জীবন। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের, প্রতিটি অংশের বা অধ্যায়ের নিজস্ব কিছু সুখ আছে, আছে কিছু দুঃখ।

কিন্তু, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায়, বিধবা জীবনে শুধুই দুঃখ-শুধুই বুকভরা কান্না। তদুপরি তাহা যদি অকাল-বৈধব্য হয় তবে ত' বলাই বাহুল্য।

শ্রীশ্রীঅখণ্ডমণ্ডলেশ্বর নারীজীবনের বিভিন্ন অবস্থায় সমৃদ্ধ-চরিত্র গঠনের জন্য "কুমারীর পবিত্রতা", "সধবার সংযম", "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য","বিবাহিতের জীবন সাধনা", -প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন।

শুধু ভাল এবং মন্দকে চিহ্নিত করাই নয়, মন্দকে জীবন হইতে নির্মূল করিবার জন্য জীবন-ভরা ইতর প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রামে ঈশ্বরে নির্ভরতা সহজ অথচ নিরবচ্ছিন্ন পন্থা হিসাবে নির্দেশিত হইয়াছে এই সব গ্রন্থে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে, স্বামীর বিয়োগে নারী জীবনে অকস্মাৎ এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আত্মীয়-পরিজন, সমাজ-সংসার এমনকি সময়ের ব্যবধানে নিজের দেহমনও বৈরীভাব নিয়া আবির্ভূত হয়।

বিধবা জীবনের হাহাকার, শূন্যতা, অনিশ্চয়তা, জীবন-জোড়া অশ্রুধারা, সম্ভাব্য সামাজিক উৎপাত এবং সর্বোপরি নিজের প্রবৃত্তির উত্থান-পতনের করুণ উপদ্রবে বিপর্যস্ত অসহায় অবস্থার বিষয়ে স্বামী স্বরূপানন্দ নীরব থাকিতে পারেন নাই। "বিধবার জীবন যজ্ঞ" গ্রন্থে বিধবা জীবনের দায়িত্ব, কর্তব্য, মহত্ব, সম্ভাবনা, উপযোগিতা, সমাজ জীবনে তার প্রভাব ইত্যাদির অভ্যুন্নত বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বিধবা জীবন যে শুধুই দুঃখের এই বোধের আমূল পরিবর্ত্তনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিধবামাত্রেরই জন্য-বিশেষতঃ অকাল বৈধব্য যাঁদের জীবনকে অসহনীয় যন্ত্রণায় দগ্ধ করিতেছে-তাঁহাদের সকলেরই জন্য এই গ্রন্থ শান্তির অমূল্য পাথেয় স্বরূপ।

অভিশপ্ত অসহায় বৈধব্যকে, সংযম ও সাধনার বলে দিব্যায়িত করে, সমাজের অপরিহার্য কল্যাণময় রক্ষাকবচ রূপে রূপান্তরিত করার বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীশ্রীঅখণ্ডমণ্ডলেশ্বরের লেখনীতে।

যদিও বিধবা জীবনকে নিরাপদ, নিষ্কণ্টক, অর্থবহ এবং কল্যাণময়ী করিবার জন্যই এই গ্রন্থ তথাপি কুমারী ও সধবা এবং এমনকি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত প্রয়াসী ও ঈশ্বরমুখী পবিত্র জীবনাকাঙ্ক্ষী পুরুষদের জন্যও এই গ্রন্থ এক অভিনব অপূর্ব্ব সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে নিঃসন্দেহে।

এই গ্রন্থের সামান্যতম প্রতিদ্বন্ধী বা সমজাতীয় কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বস্তুতঃ বিধবা জীবনকে কল্যাণময়ী সামাজিক সম্পদরূপে কল্পনা করিবার মত সাহসী মনোভাবও আজ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করি নাই। আমরা সৌভাগ্যবান্ যে, যুগস্রষ্টা মহর্ষি অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের করুণায় বিশ্বসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্ধী এমন একটি গ্রন্থ আমরা বাংলাভাষায় লাভ করিয়াছি এবং এই দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থের বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া আমরা ধন্যাতিধন্য।

ইতি-ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, ১৪০৮ সাল

বিনীত নিবেদক-
ডাঃ যুগল ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

আসিবে সেদিন আসিবে
রমণী যেদিন
দেবী প্রতিভায়
যত মলিনতা নাশিবে।

—স্বরূপানন্দ—

উপহার

ওঁ

বিধবার জীবন-যজ্ঞ
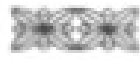
প্রথম পত্র

ওঁমা কলিকাতা

২০ শ্রাবণ, ১৩৩৪

কল্যাণীয়াসু ঃ-

মা, তুমি ব্রহ্মচারিণী। এইজন্য স্নেহের পাত্রী জানিয়াও অন্তরে আমি তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকি। "বিধবা" কথাটা বলিতে লোকে যে তাচ্ছিল্যের ভাব মনে মনে পোষণ করে, আমার পক্ষে ব্যাপার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিধবার কথা মনে পড়িলে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে আমার মস্তক তাঁহার চরণতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। কারণ, আমি ব্রহ্মচর্য্যেরই উপাসক এবং পুণ্যশীলা বিধবাদের জীবনে আমি ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাকেই মূর্ত্তিমতী দেখিতে পাই। **বিধবা দেখিলেই আমার মনে হয়, তাঁহার পরিহিত বস্ত্রখানার ন্যায় তাঁহার মনও শুভ্র**। বিধবারা শাদা কাপড় পরেন, আর সধবারা মনে করেন যে ইহা দুর্ভাগ্যেরই চিহ্ন, কিন্তু আমার কি মনে হয় জান মা? আমার মনে হয় যে, **সংযমের দ্বারা যিনি চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যিনি মানসিক পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে শুভ্র-বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই শোভাপ্রদ হইতে পারে না। কারণ, শুভ্রতা পবিত্রতারই দ্যোতক, শুদ্ধতারই পরিচায়ক**। এই জন্য আমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর একখণ্ড গৈরিক বস্ত্র আর সদাচার-পরায়ণা বিধবার একখণ্ড শুভ্র বস্ত্রকে সমান গৌরবের ও সমান পূজার দৃষ্টিতে

দেখিয়া থাকি। বিধবা অলঙ্কার পরেন না, পাড়যুক্ত বস্ত্র পরিধান করেন না, ললাটে সিন্দুরবিন্দু দেন না,—এই গুলি তাঁর দুর্ভাগ্য নয় মা। সধবারা ভুল বুঝিয়া এইগুলিকে দুর্ভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন মাত্র। স্বামি-হীনা হইলে স্ত্রীলোক-মাত্রকেই এইগুলি বাধ্য হইয়া পরিবর্জ্জন করিতে হয় বলিয়া এই ত্যাগের সহিত সকল স্ত্রীলোকের মনে এক বিরাট আতঙ্ক ও বিভীষিকা জড়াইয়া রহিয়াছে। সমাজ-শাসন যদি সকলের উপর ঐ ভাবে বাধ্যকর না হইত, শাঁখা-সিন্দুর বর্জ্জন যদি স্বামিহীনার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে হইতে বা না হইতে পারিত, তাহা হইলে এই বর্জ্জনের সহিত বিভীষিকা থাকিত না। তখন প্রত্যেক বিধবা শঙ্খ-সিন্দুর ত্যাগের প্রকৃত মর্ম্ম, মর্য্যাদা ও মহিমা বুঝিতে পারিত।

সধবা নারী অলঙ্কার পরে, কিন্তু কি জন্য পরে মা? স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য নহে কি? সধবার কেশ-পরিচর্য্যা, সধবার চ'খের কাজল, সবই কি স্বামীর চিত্ত মুগ্ধ করিবার জন্য নহে? স্বামীই তাহার জাগরণের ধ্যান, স্বামীই তাহার নিদ্রার সুমধুর স্বপ্ন, স্বামীই তাহার জীবনে ও মরণে, সুখে এবং দুঃখে, সর্ব্বদা ও সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র বাঞ্ছিত। তাঁহাকে প্রাণেরও প্রাণ-স্বরূপে হৃদয়মধ্যে পাইবার জন্য এবং নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই তাহার যত চিন্তা ও যত চেষ্টা। যেভাবে স্ত্রীকে পাইলে স্বামীর সুখ বর্দ্ধিত হইবে, সে নিজেকে প্রতিনিয়ত সেইভাবেই গড়িয়া লইতে চাহে। হাসিমুখ দেখিলে স্বামীর সুখ হইবে, তাই সে পরম দুঃখের মধ্যেও মুখের হাসিটীকে বর্জ্জন করে না। সৌন্দর্য্য দেখিলে স্বামী সুখী হইবেন, তাই সে যত্ন করিয়া চুল বাঁধে, কপালে সিঁদুর দেয়, টিপ্ পরে, চ'খে কাজল দেয়, বারাণসী, পার্শী বা ঢাকাই শাড়ী পরে, পায়ে আল্‌তা মাখে। আত্ম-সুখ-দুঃখের বিচার তার নাই, স্বামি-সুখ লাগিয়াই তাহার যত আকিঞ্চন। নিজ সুখের অনুরোধ তাহার নাই, স্বামি-সুখের বাঞ্ছাই তাহার একমাত্র সুখ।

কিন্তু মা, তাহার এই স্বামীটী কে, তাহা বলিতে পার কি ? এই স্বামীটীর স্বরূপ কি ? ইহার সরল উত্তর এই যে, সধবার এই স্বামীটী প্রধানতঃ একটি রক্তমাংসের দেহ এবং রক্ত মাংসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত একটি মন। তাই, এই দেবতার পূজাও হয় প্রধানতঃ রক্তমাংসে। রণচণ্ডিকা ধ্বংসময়ী দেবতা, তাই, তাঁহার পূজায় বলি দিতে হয় জীবন্ত প্রাণী,—আগে ত' নরবলি পর্য্যন্ত চলিত। বিষ্ণু স্থিতির দেবতা, পালন তাঁহার স্বভাব, দয়া তাঁহার নিত্যধর্ম্ম, তাই তাঁহার ভক্তেরা পশুবলির নামে কম্পিত-কলেবর হন। যিনি যেমন দেবতা, তাঁহার পূজার আয়োজন এবং পূজার পদ্ধতি হইবে তদুচিত। সাত্ত্বিক দেবতার সাত্ত্বিকী পূজা, আবার তামসিক দেবতার তামসিকী অর্চ্চনা। অশ্বত্থামা বিল্ববৃক্ষের শাখা দ্বারা শিবঠাকুরকে ক্রোধভরে প্রহার করিয়াছিলেন, আর উহাতেই ঠাকুর পরম পরিতুষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। অন্য প্রকারে শিবঠাকুরকে খুসী করা কঠিন হইত, কেননা ইনি দেবতাই এক আলাদা থাকের।

বিধবারও স্বামী আছে। **শুধু সধবারাই স্বামীবতী তাহা নহে ; বিধবা নারীও স্বামী-সৌভাগ্যশালিনী**। তবে, সধবার স্বামী আর বিধবার স্বামী এক থাকের দেবতা নহে। একজন রক্তমাংসের দেবতা, অপর জন বিদেহী দেবতা। একজন সীমাবদ্ধ দেবতা, আর একজন সীমাহীন দেবতা। একজন একটি মাত্র নারীর দেবতা, অপর জন ব্রহ্মাণ্ডের সকল নারীর ও সকল পুরুষের দেবতা। সধবার স্বামী একটি নির্দ্দিষ্ট মানুষ ; **কিন্তু বিধবার স্বামী কোনও মানুষ নহেন, পরন্তু সকল মানুষের যিনি স্রষ্টা, সকল মানুষের যিনি পালনকর্ত্তা, সকল মানুষের যিনি সংহারকারী, সকল মানুষের যিনি পূজ্য, সকল মানুষের যিনি পতি, সকল মানুষের যিনি জীবন এবং সকল মানুষের যিনি গুরু, সেই পরমপুরুষই বিধবার স্বামী**। সধবার স্বামীর শরীরের একটা মাপ আছে, শক্তি-সামর্থ্যের একটা শেষ আছে কিন্তু

বিধবার স্বামীর শরীরের দৈর্ঘ্য কতখানি, প্রস্থ কতখানি, বেধ কতখানি, শক্তি-সামর্থ্যেরই বা পরিমাণ কতটা, ইহা কেহ কখনও মাপিয়া-জুখিয়া দেখিতে সমর্থ হয় নাই ; কারণ, **যাঁহার প্রতি রোমকুপে কোটি ব্রহ্মা, কোটি বিষ্ণু ও কোটি মহেশ্বর বিরাজ করেন, যাঁহার পদনখের একটি কোণায় কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রনিচয় অবস্থান করে, যাঁহার ইচ্ছার ইঙ্গিতে পলকমধ্যে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন-বিলয় ঘটে, সেই অপ্রতিহত-পরাক্রম পরব্রহ্মই বিধবার স্বামী।**

সুতরাং বিধবা তাঁহার স্বামীর পূজা সধবার বিধিতে কি করিয়া করিবেন ? সীমাবদ্ধ দেবতাটীকে পূজা করিবার জন্য সধবাকে সীমাবদ্ধ হইতে হয়, গলায় হার পরিয়া, হস্তে বলয় পরিয়া, তাহাকে বন্ধন স্বীকার করিতে হয় এবং কাপড়ে পাড় রাখিয়া তাহাকে সীমাবদ্ধতার পরিচয় দিতে হয়। কিন্তু বিধবার দেবতা যে সীমাহীন ! সে যে তাঁহার অসীম স্বামীকে অর্চ্চনা করিবার জন্য নিজেও সকল সসীমতা বর্জ্জন করিবে। বিলাস-সজ্জায় সাজিলে ত' আর সেই পরমপতির আনন্দবর্দ্ধন করা যাইবে না ! তাই, বিধবা হার ও বলয় ত্যাগ করে, কারণ হার ও বলয় বন্ধনের চিহ্ন। তাই, বিধবা শুভ্র বস্ত্র পরে, কারণ, শুভ্রতা অন্তরের পবিত্রতার জ্ঞাপক এবং পরমপতি পবিত্রতাতেই তুষ্ট হন। তাই, বিধবা দেহের সজ্জা পরিহার করে, কারণ, পরমপতি দেহের বিলাস চাহেন না, তিনি চাহেন আত্মার বিলাস। তাই, বিধবা ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, কারণ, নারীদেহের সসীম ইন্দ্রিয়গুলি সেই অসীম স্বামীর সুখোৎপাদনে যথেষ্ট নহে, অসীম ইন্দ্রিয়নিচয় দিয়া তাঁহার সুখোৎপাদন করিতে হয়। ভোগ-সুখ বর্জ্জনের মধ্য দিয়াই, প্রবৃত্তির নিরোধের মধ্য দিয়াই, ইন্দ্রিয়-সংযমের মধ্য দিয়াই সেই অসীম ইন্দ্রিয়নিচয়ের বিকাশ ঘটে। ইহা শুধু একটা মনগড়া কথা নহে,–সহস্র

সহস্র সাধকের জীবনে ইন্দ্রিয়-সুখ-ত্যাগের এই অপূর্ব্ব শুভফল ফলিয়াছে। এইজন্যই বিধবার জীবনে এত কঠোরতা, এত স্বেচ্ছাবৃত দুঃখভোগ !

ভগবানই যে তোমার স্বামী, এ কথা আজ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি কর মা। **ভগবানকে স্বামী পাইয়াছ,—ভগবানের সকল পুত্র-কন্যা তোমার সন্তান-সন্ততি**। যখনিই দেখিবে, কোনও মানব বা মানবী হাসির ছটায় দিগন্ত আলোকিত করিতেছে, জানিও মা, ইহা তোমারই পুত্র-কন্যার মুখের হাসি। যখনই দেখিবে, কোথাও কেহ বুক ফাটাইয়া গগনভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছে, জানিও মা, ইহা তোমারই পুত্র-কন্যার ক্রন্দন ও হাহাকার। যখনই দেখিবে, মানবজাতি ধর্ম্মের বলে, কর্ম্মের বলে, উদগ্র তপস্যার বলে হিমাচল লঙ্ঘন করিয়া অবহেলে উন্নতির পথে ছুটিয়া যাইতেছে, জানিও মা, ইহা তোমারই পুত্র-কন্যার অভ্যুদয় ; আবার যখন দেখিবে, ন্যায় ও ধর্ম্ম পদবিদলিত করিয়া, সুনীতি ও সদ্‌বুদ্ধিকে অবমানিত করিয়া মানুষের বংশধরেরা পাপের পিচ্ছিল পথে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে খরবেগে নামিয়া যাইতেছে, তখনও জানিও মা, ইহা তোমারই পুত্র-কন্যার অধঃপতন—তোমারই সন্তান-সন্ততির দুর্গতি। জগতের সমক্ষে তুমি আজ বরাভয়দাত্রী মায়ের মনোমোহিনী সজ্জা ধরিয়া আবির্ভূতা হও মা। মা হইয়া আজ তৃষ্ণার্ত্ত সন্তানকে দাও সুপেয় শান্তি-বারি, ক্ষুধার্ত্ত সন্তানকে দাও আজ ক্ষুধার অন্ন, আর জ্ঞানদৃষ্টি-হীন অজ্ঞানান্ধ সন্তানের দীপ্তিহীন চক্ষে আজ ফুটাইয়া তোল মা তপঃশুদ্ধ দিব্যদৃষ্টি। বৈধব্য তোমাকে যতই কঠোরতায় নিষ্পেষিত করিতে থাকুক, এই নিষ্পেষণের মধ্য দিয়াই তুমি জগজ্জননীর মহিমামণ্ডিত স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীনা হও মা। শ্রীভগবান্ তোমার স্বামী,—তাঁহার সহিত তুমি সর্ব্বদেহপ্রাণে, কায়মনোবাক্যে, সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিতা হও মা। তাঁহার হৃদয়ে তোমার হৃদয় মিলাও, তাঁহার আঁখিতে তোমার আঁখিতারা বাঁধিয়া রাখ। নিজেকে তাঁহারই শ্রীচরণারবিন্দের একান্ত সেবিকা জানিয়া,

নিজেকে একমাত্র তাঁহারই সেবার দাসী জানিয়া তোমার দেহ-মন, জীবন-যৌবন তাঁহারই সেবা-সাধনার্থ উৎসর্গ করিয়া দাও মা। জানো মা, তাঁহাকে আপন করিতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক। জানো মা, শ্রীভগবান্ যতই তোমার আপনার আপন হইবেন, তাঁহাকে তোমার হৃদয়েশ্বর বলিয়া যতই তুমি গভীরতর ভাবে অনুভব করিতে পারিবে, ততই তুমি জগদ্‌বাসী সর্ব্বজীবের মায়ের স্থানটী অধিকতর সহজ ভাবে অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। ঐ শুন মা, আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আজ কোটি কোটি মানব-সন্তান তোমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। আর্ত্ত কহিতেছে,–"কৈ মা এস, দুঃখ ঘুচাও।" দুঃস্থ কহিতেছে,–"কৈ মা এস, অশ্রু মুছাও।" তোমারই মুখপানে চাহিয়া তোহার পরপদানত সন্তানকুল স্বাধীনতার সুখাশায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে, তোমারই উদ্দেশ্যে আজ ঘরে ঘরে শারদীয়া মহাপূজার মহাঋক্ ভক্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, "জাগৃহি জননি, হে মা জাগো।" ইতি–

তোমার পাগলা ছেলে

স্বরূপানন্দ

দ্বিতীয়পত্র

জয় মা

কলিকাতা

২৫ শ্রাবণ, ৩৪

নিত্যনিরাপদাসু ঃ–

মা *** তোমাদের জীবন দুঃখেরই জীবন, তোমরা যেন বেদনারই জীবন্ত প্রতিমা। অপরিণত বালিকা বয়সে একদিন যাঁহাকে জীবনের পরমসঙ্গীরূপে পাইয়াছিলে, যাঁহার চাইতে প্রিয়তম কিছু ছিল না, যাঁহাকে হৃদয়ের হৃদয় বলিয়া জানিতে, যাঁহাকে জীবনেরও জীবন বলিয়া মানিতে, যিনি একাধারে তোমার প্রভু ও সখা ছিলেন, যিনি

একাধারে তোমার গুরু এবং প্রাণপ্রিয় ছিলেন, তিনি যেই দিন নশ্বর মানব-তনু পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামের যাত্রী হইলেন, সেইদিন হইতেই তোমার সুখসূর্য্য অস্ত গেল, দুঃখ-নিরাশ অন্ধকার তোমাকে ঘিরিয়া ধরিল, তুমি অনাথিনী হইলে, পর-মুখাপেক্ষিণী হইলে ! সেইদিন হইতে তোমরা পিতামাতার চক্ষুশূল, শ্বশুর-বংশের জঞ্জাল, সধবাকুলের আপদ এবং মনুষ্য-সমাজের অনাদর ও উপেক্ষার বস্তু হইলে। স্বামীর চিতানলে শুধু তাঁহার দেহই পুড়িল না,—সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মান-মর্য্যাদা সুখ-সৌভাগ্য, আশাভরসাও পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইল। সেইদিন হইতে তোমাদের মুখের হাসি ফুরাইয়াছে, চ'খের দীপ্তি ম্লান হইয়াছে, প্রাণের উৎস শুকাইয়া গিয়াছে ; তোমরা আজ নির্জ্জীব প্রস্তরের মত বিনা প্রতিরোধে সংসারের সকল দুঃখকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছ।

এই দুঃখ তোমাদের অগৌরব নহে মা। স্বেচ্ছায় যাহারা দুঃখকেই ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লয়, দুঃখ তাহাদিগকে দেবত্ব দান করে। কঠিন দুঃখ-ভোগের মূল্যে এই দেবত্বকে তোমরা ক্রয় করিয়াছ। ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ সংযমের বলে তোমরা জীবনকে পুণ্যময় করিয়াছ। কিন্তু মা, তোমাদের এই দেবত্বের সার্থকতা ত' মনুষ্য-সমাজ আজও দেখিতে পাইতেছে না। তাই আজ, হে দুঃখময়ি জননী, জীবন যাত্রার বিশিষ্টতা দিয়া তোমাদিগকে সকলের ভ্রম ভাঙ্গিতে হইবে। তোমাদের পবিত্র জীবনের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দিয়া তোমাদের পিতামাতাকে আজ বুঝাইতে হইবে যে, কন্যা বিধবা হইলে সে চক্ষুশূলই হয় না, ইচ্ছা করিলে সে বিশ্বজগতের চক্ষুকে রোগমুক্ত ও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে পারে ! তোমাদের কর্ম্মময় জীবনের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দিয়া আজ তোমাদের শ্বশুরবংশকে সচকিত ও বিস্মিত করিয়া দিতে হইবে, যেন তাঁহারা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন যে, বিধবারা বংশের কলঙ্কিত জঞ্জাল নহেন, পরন্তু কুলের উজ্জ্বলতা-বিধাত্রী। তোমাদের সংযম-শুদ্ধ ইন্দ্রিয়-বিমুখ জীবনের পবিত্রতার জাজ্জ্বল্যমান

দৃষ্টান্তসমূহ দিয়া স্বামিসৌভাগ্যদর্পিতা সধবাকুলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, **বিধবারা সংসারের আপদ নহেন, পরন্তু সম্পদ**। তোমাদের মনুষ্যত্ব সঞ্জীবক বিশ্বপ্রীতি-পরিপুষ্ট জীবনের ঐকান্তিকী সেবা দ্বারা মনুষ্য-সমাজকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, তোমরা প্রকৃতই উপেক্ষার বস্তু নহ, তোমাদের কাছে মনুষ্য-সমাজ অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ আছে।

এইভাবে তোমাদিগকে তোমাদের দুঃখময় জীবনকে দেববাঞ্ছিত সার্থকতা দিতে হইবে। আজ তাহারই জন্য প্রস্তুত হও মা। নিজে জীবনব্যাপী দুঃখকে যেমন নিঃসঙ্কোচে বরণ করিয়াছ, তেমন করিয়া দুঃখ বরণ করিবার প্রেরণাকে আজ স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সমাজের সকল স্তরে জাগাইয়া তোল। তুমি যেমন দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মান না, দুঃখের প্রতি সে অগ্রাহ্যের ভাব সর্ব্বব্যাপী ভাবে সৃষ্টি কর। তোমার পক্ষে ত্যাগের পন্থা যেমন স্বাভাবিক, তোমার পক্ষে সংযমের পন্থা যেমন সরল, তোমার পক্ষে নিবৃত্তির পথ যেমন সুগম, অপর সকলের পক্ষেও যাহাতে তেমন স্বাভাবিক, সরল ও সুগম হয়, তাহা কর। এ কাজ সহজ নহে, কিন্তু কঠিন দুঃখকে সহ্য করিয়া তোমরা কঠিন কার্য্যের যোগ্যা হইয়াছ। কারণ, দুঃখই মানুষকে মহৎ করে, দুঃখই তাহাকে যোগ্যতা দেয়।

তোমাদিগকে আজ সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ-ভাবে তোমরা নারীসমাজেই কাজ করিবে, পুরুষ-সমাজের উপর তোমাদের প্রভাব সোজাসুজি গিয়া হয়ত পড়িবে না, একটু গৌণভাবেই হয়ত পড়িবে। **তোমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে—কুমারীর তরুণ মনে, বালবিধবার শোকাভিভূত হৃদয়ে, লাঞ্ছিতা অবমানিতা স্বজন-পরিত্যক্তা অনাথিনীদের প্রাণে**। একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের জন্য কুমারীকে প্রস্তুত করিবে, পতি-বিয়োগ-বিধবার কাণে জগৎপতির পরম-প্রেমের অমৃতময়ী বাণী শুনাইয়া তাঁহার পদতলে আত্মসমর্পণ করিবার শক্তি যোগাইবে, দুঃখিনী অনাথিনীকে বুকে টানিয়া

আনিয়া আদর-সোহাগে অভিভূত করিয়া তাহাকে নবজীবনের চিরকল্যাণময় পন্থা প্রদর্শন করিবে। তোমাদের জীবনের পবিত্র প্রভাব প্রত্যেকটী কুমারীর জীবনের উপর এমন ভাবে পড়ুক, যেন বিবাহের পরে তাহার স্বামী দাম্পত্য-জীবন হইতে লাম্পট্যকে নির্ব্বাসিত করিতে প্রণোদিত হয়। তোমাদের জীবনের পুণ্যময় প্রভাব প্রত্যেকটী বিধবার জীবনের উপরে এমন ভাবে পতিত হউক, যেন বিধবার পুনর্ব্বিবাহের প্রচলনের জন্য যে সময়োচিত আন্দোলন সম্প্রতি দিনের পর দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, প্রত্যেক বিধবার নয়নের নিষ্কলুষ দীপ্তি দেখিয়া তাহা থমকিয়া দাঁড়ায় এবং আচম্বিতে অদৃশ্য হয়। তোমাদের জীবনে অব্যর্থ প্রভাব প্রত্যেকটী স্বজন-পরিত্যক্তা হতভাগিনীর জীবনকে এমনভাবে গড়িয়া তুলুক, যেন ইহাদের প্রাণপাত প্রয়াসে নারী-জীবনের পাতিত্যের স্রোত চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া শুকাইয়া যায়, পুরুষ-জাতি যেন নারী-জাতিকে অবজ্ঞা করিবার আগে, লাঞ্ছিত করিবার আগে, পদদলিত করিবার আগে শতবার নিজেদের ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া ম্রিয়মাণ ও বিনম্র হয়। **প্রত্যেকটী নারীর অন্তরে তোমরা অগ্নি শলাকা লইয়া প্রবেশ কর, তাহাদের হৃৎপিণ্ডে উচ্চাকাঙ্ক্ষার দাবানল ধরাইয়া তারপরে বাহির হইয়া** আসিও। শেলের মত তোমরা সমাজের গুপ্ত অকল্যাণকে ধ্বংস কর এবং নিজেদের তপস্যার শক্তিতে বিপথ-গামিনীকে সুপথে আন, অমঙ্গলের অনুরাগিণীকে মঙ্গলে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, পতনোন্মুখিনীকে সপ্রেম বাহু-বিস্তার করিয়া রক্ষা কর। তোমরা জগৎপতির প্রেয়সী, সমস্ত নরনারী তোমাদের সন্তান-সন্ততি। সুতরাং ইহারা যখন পাপের পথে চলিতে চাহিবে, তখন তোমরাই ত' মা মাতৃময়ী স্নেহশীলতায় ব্যাকুল হইয়া ইহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ছুটিয়া যাইবে। যখন ইহারা অমৃত বলিয়া হলাহল পান করিতে চাহিবে, তখন তোমরাই ত' মা নিশ্চিত মরণ হইতে ইহাদিগকে বাঁচাইবে ; তোমাদের

স্বামি-বিয়োগ জগৎস্বামীকেই পাইবার জন্য। তোমরা অনাথা, জগন্নাথের প্রত্যেকটী পুত্র ও কন্যাকে নিজ পুত্র-কন্যা রূপে পাইবার জন্য! *** ভাল আছি। তোমাদের কুশল দিও। ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

তৃতীয় পত্র

ওঁ তৎসৎ

কলিকাতা

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ–

স্নেহের মা, *** কখনও ভুলিও না, ভগবান্ তোমার কে, ভগবান্ তোমার কত আপন। নিমেষের জন্য বিস্মৃত হইও না যে, তোমার দেহ, তোমার মন, তোমার চিন্তা এবং তোমার কর্ম্ম, সবই ঐ নিখিলপ্রেমময় শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করিবার জন্য। ভোগ-পথের পথিকেরা সংসারকে যে দৃষ্টিতে দর্শন করে, সংসারের প্রতি তোমার চক্ষু কখনই যেন সেই দৃষ্টি সঞ্চারিত না করে। ভোগার্থীরা যাহা কিছু দেখে, সবই তাহাদের নিজেদের জন্য মনে করে, সবই তাহাদের আত্মসুখের চরিতার্থতার জন্য ব্যবহার করিতে চাহে। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে সংসারের যত বস্তু পড়িতেছে এবং পড়িবে, জানিও, উহার এক কণাও তোমার জন্য নহে,–সবই শ্রীভগবানের জন্য। নিজের দেহের প্রতি যখন তোমার দৃষ্টি পড়িবে, তখন জানিও, এ দেহ ভগবানের জন্য, তোমার কোন প্রকার আত্ম-সুখের বা বিলাস-লালসার তৃপ্তির জন্য নহে। নিজের মনের প্রতি যখন তোমার লক্ষ্য পড়িবে, তখন মনে রাখিও যে, এই মনটীও ভগবানেরই সুখের জন্য, নিজ সুখের চিন্তায় ব্যাপৃত রহিবার জন্য নহে। **যখন যে কর্ম্মে হাত দাও, মনে রাখিও, তোমাকে করিতে**

স্বামি-বিয়োগ জগৎস্বামীকেই পাইবার জন্য। তোমরা অনাথা, জগন্নাথের প্রত্যেকটী পুত্র ও কন্যাকে নিজ পুত্র-কন্যা রূপে পাইবার জন্য ! ❋❋❋ ভাল আছি। তোমাদের কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

তৃতীয় পত্র

ওঁ তৎসৎ

কলিকাতা

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ–

স্নেহের মা, *** কখনও ভুলিও না, ভগবান্ তোমার কে, ভগবান্ তোমার কত আপন। নিমেষের জন্য বিস্মৃত হইও না যে, তোমার দেহ, তোমার মন, তোমার চিন্তা এবং তোমার কর্ম্ম, সবই ঐ নিখিলপ্রেমময় শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করিবার জন্য। ভোগ-পথের পথিকেরা সংসারকে যে দৃষ্টিতে দর্শন করে, সংসারের প্রতি তোমার চক্ষু কখনই যেন সেই দৃষ্টি সঞ্চারিত না করে। ভোগার্থীরা যাহা কিছু দেখে, সবই তাহাদের নিজেদের জন্য মনে করে, সবই তাহাদের আত্মসুখের চরিতার্থতার জন্য ব্যবহার করিতে চাহে। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে সংসারের যত বস্তু পড়িতেছে এবং পড়িবে, জানিও, উহার এক কণাও তোমার জন্য নহে,–সবই শ্রীভগবানের জন্য। নিজের দেহের প্রতি যখন তোমার দৃষ্টি পড়িবে, তখন জানিও, এ দেহ ভগবানের জন্য, তোমার কোন প্রকার আত্ম-সুখের বা বিলাস-লালসার তৃপ্তির জন্য নহে। নিজের মনের প্রতি যখন তোমার লক্ষ্য পড়িবে, তখন মনে রাখিও যে, এই মনটীও ভগবানেরই সুখের জন্য, নিজ সুখের চিন্তায় ব্যাপৃত রহিবার জন্য নহে। **যখন যে কর্ম্মে হাত দাও, মনে রাখিও, তোমাকে করিতে**

হইবে—ভগবানেরই কাজ। তোমার নিজের বলিয়া এ জগতে ভগবান্ ছাড়া আর কিছু নাই মা। জগতের কোনও বস্তু তোমার নয়, জগতের কোনও মানুষ তোমার নয়। যত বস্তু আর যত মানুষ সবই ভগবানের আর সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানই একমাত্র তোমার। তোমার মাতা তোমার কেহ নহেন, তোমার পিতাও তোমার কেহ নহেন, তোমার ভ্রাতা-ভগ্নী, সখা-সখী, আত্মীয়-আত্মীয়া প্রভৃতি কেহই তোমার কিছু নহেন, পরন্তু একমাত্র ভগবান্ই তোমার আশ্রয়, তিনিই তোমার সহায়, তিনিই তোমার প্রার্থিত। তিনিই তোমার হৃদয়ের রত্ন, বুক-জুড়ান ধন, প্রাণের মাণিক। তিনিই তোমার আশা, ভরসা এবং সান্ত্বনা। তিনিই তোমার একমাত্র আরাধ্য, একমাত্র শরণ্য, একমাত্র আপনার জন। সাধারণ দৃষ্টিতে যাঁহাদিগকে মা, বাবা, ভাই, ভগ্নী, সখা, সখী, আত্মীয়, আত্মীয়া বলিয়া দেখিয়া থাক, তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার কেহই নহেন, তাঁহারা ভগবানেরই জিনিষ বলিয়া তুমি তাঁহাদিগকে আদর কর, স্নেহ কর, ভালবাস। তোমার এবং তোমার মায়ের মধ্যে ভগবান্ দাঁড়াইয়া আছেন, তাই মা তোমার আপন জন, নহিলে পরেরও পর। ভগবানেরই সম্পর্কে জগতের সকলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। ভগবানেরই যোগে সকলের সঙ্গে তোমার যোগ। যেখানে মধ্যস্থলে ভগবান্ দাঁড়াইয়া নাই, সেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহারও সহিত তোমার কোনও সম্বন্ধ নাই। হয়ত একজন বন্ধু আসিল, সে আসিয়া তাহার সদানন্দ ভাব, মধুময়ী কথা ও সহৃদয় ব্যবহারের দ্বারা তোমার চিত্তকে মুগ্ধ করিল, তোমার মনকে আকৃষ্ট করিল। তখন তোমার কর্ত্তব্য কি হইবে মা, বল দেখি? অমনি কি তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইবে?—না। সর্ব্বাগ্রে তোমাকে দেখিতে হইবে, তোমার আর তাহার মধ্যে ভগবান্‌কে স্পষ্ট অনুভব করা যাইতেছে কি না। তাহার প্রতি তোমার চিত্তের যে প্রসন্ন ভাব, তাহার প্রতি তোমার মনের যে টান, ইহার মূলে শ্রীভগবান্ই বিরাজ করিতেছেন

কিনা। যদি দেখিতে পাও যে, ভগবান্ ওখানে নাই, তবে জানিও, এই বন্ধু তোমার বন্ধু নহে, তোমার পরম শত্রু। যদি দেখ যে, বন্ধুর প্রতি তোমার প্রাণের আকর্ষণের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে শ্রীভগবানের অবস্থিতি অনুভব করিতে পারিতেছ না, তাহা হইলে জানিও, এই বন্ধুত্ব বিষময় ফল প্রসব করিবে। যদি দেখ যে, বন্ধুর প্রতি তোমার যে অনুরাগ, তাহার মধ্যে ভগবৎপ্রীতির অভাব অথবা বিরোধ আছে, তাহা হইলে জানিও, এই অনুরাগ তোমাকে নরকগামিনী করিবে। বন্ধুকে দেখিলে যদি ভগবানের কথা মনে না পড়ে, ভগবানের স্মৃতি বাদ দিয়া যদি বন্ধুর কথা ভাবিবার তোমার সামর্থ্য থাকে, তবে জানিও, এই বন্ধু তোমার বন্ধু নহে,—সে তোমার শান্তির বৈরী, পবিত্রতার বৈরী, মনুষ্যত্বের বৈরী, সতীত্বের বৈরী। যদি তাহা দ্বারা উপকৃতা হইয়া থাক, কৃতজ্ঞতা পোষণ কর, ক্ষতি নাই,—কিন্তু তাহাকে বন্ধু বলিয়া মনে মনে বিশ্বাস করিও না। তাহার সদ্ব্যবহার যদি তোমার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া থাকে, করুক, ক্ষতি নাই ; কিন্তু বন্ধুর প্রাপ্য প্রাণ-উজাড়-করা ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া বিপদ ডাকিও না। ভগবানের মধ্য দিয়াই তোমাকে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতে হইবে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য দিয়া ভগবানকে নয়।

ভগবান্ তোমাকে ব্রহ্মচর্য্যের সুযোগ দিয়াছেন, সংযমের পথে, ত্যাগের পথে, নিবৃত্তির পথে চলিবার আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন,—তোমার আচরণ ও জীবন-প্রণালী সাধারণের মত হইবে না ! সামান্য জীব বন্ধুত্বের আকর্ষণের মধ্য দিয়া ভগবানকে পাইতে চাহে, কিন্তু অসামান্য ব্যক্তি ভগবানের মধ্য দিয়াই বন্ধুত্বকে স্বীকার করেন। সামান্য জীবের পক্ষে বন্ধুটীই আগে প্রার্থনীয়, বন্ধুকে পাইলে পরে সে ভগবানকে পাইবার খোঁজ দেখে কিন্তু অসামান্য ব্যক্তির পক্ষে প্রথম প্রার্থনীয় শ্রীভগবান্ স্বয়ং,—বন্ধু-বান্ধবী, সখা-সখী তার পরের কথা। সামান্য জীবের পক্ষে বন্ধুটী অপরিহার্য্য, ভগবান্‌কে বরং বাদ দিলেও

চলে, কিন্তু অসামান্য ব্যক্তির পক্ষে ভগবানই অপরিবর্জ্জনীয়, বন্ধুকে বাদ দিলে কিছু যায় আসে না। তুমি সামান্যা নহ বলিয়াই বৈধব্যের অধিকারিণী হইয়াছ, সুতরাং তোমার জীবন-যজ্ঞের আয়োজনও সামান্য হইতে পারে না। ভগবান্‌ই তোমার শ্বাসের বায়ু, পিপাসার জল ও ক্ষুধার অন্ন। ভগবানই তোমার চোখের আলো, হৃদয়ের স্পন্দন এবং বাহুর শক্তি। ভগবান্‌ই তোমার প্রেম, তোমার প্রেম-দাতা এবং তোমার প্রেমার্থী। ভগবান্‌ই তোমার প্রেমের ভূমি, প্রেমের অঙ্কুর এবং প্রেমের ফুল। ভগবান্‌ই তোমার বসন্তের কোকিল, ভগবান্‌ই তোমার মলয়ের হিল্লোল, ভগবান্‌ই তোমার পূর্ণিমার শশধর। ভগবান্‌কে যদি জীবন দান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার জীবনটা ভগবানেরই জীবনে পরিণত হইবে, তুমি ভগবানই হইয়া যাইবে। পরশ-পাথরে লোহা ছোঁয়াইলে তাহা সোণা হয়। তুমিও যদি মা তোমার জীবনটাকে ভগবানের পায়ে একবার ছোঁয়াইয়া দিতে পার, তাহা হইলে ভগবান্ হইবে। তখন তোমার উপরে অসত্যের প্রভুত্ব চলিবে না, অপবিত্রতার প্রভাব পড়িবে না, অধর্ম্মের অধিকার থাকিবে না, পদস্খলনের সম্ভাবনা রহিবে না। তখন তুমি নিত্যমুক্ত এবং অপাপবিদ্ধ। তখন কোনও মানুষের আশ্রয়ের প্রয়োজন তোমার পড়িবে না, তোমাতেই তুমি আশ্রয় পাইবে ; তখন তোমাকে পরমুখাপেক্ষিণী হইয়া থাকিতে হইবে না, তুমি শুধু তোমারই মুখাপেক্ষা করিবে ; তখন তোমার বয়স বা বুদ্ধি বাহিরের প্রলোভন বা আকর্ষণে বিন্দুমাত্র অভিভূত হইবে না, তোমার হৃদয় আত্মগত ভগবৎ-প্রেম-রসেই দিবানিশি মজিয়া থাকিবে।

এই অবস্থা লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন। যত্ন ছাড়া রত্ন লাভ হয় না। এই যত্ন ভগবানের নামযোগেই করিতে হয়। নামের মধ্য দিয়া প্রেম ফোটে, নামের বলে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর ত্রিভুবন-আলো-

করা জ্যোতির্ম্ময় চিদ্‌ঘন রূপ লইয়া নামের বলে তিনি ভক্তের নয়নের সুমুখে আসিয়া দাঁড়ান। তাঁর সকল-পিপাসা-মিটান সুললিত স্বরলহরী লইয়া নামের বলে ভক্তের কাণের কোণে আসিয়া কত সুমধুর কথা কন, কত অনির্ব্বচনীয় রহস্যের আলাপন করেন। প্রাণ খুলিয়া যে একবার তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় নাম ধরিয়া ডাকে, আকুল-বিহ্বল হইয়া দু'বাহু প্রসারিয়া তিনি তাহাকে আলিঙ্গন দিতে ছুটিয়া আসেন, তাঁর অপূর্ব্ব প্রেমমাখা স্বভাবটী লইয়া নামের বলে তিনি ভক্তের হৃদয়ে হৃদয় মিলান। ❋❋❋ ভাল আছি, শ্রীপ্রভু তোমাকে নিয়ত তাঁহার আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করুন। ইতি—

শুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ

চতুর্থ পত্র

জয় গুরু শ্রীগুরু — কলিকাতা

৩২শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

আদরিণী মা, তোমার কৌলিক নামের সহিত সাংসারিকতার স্মৃতি বিজড়িত আছে। তাই, আমি তোমার নাম রাখিলাম "গঙ্গা"। এখন হইতে "গঙ্গা-মাঈ" বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিব। তোমার এই পাগলা ছেলের এইটী আব্‌দার। গঙ্গাজল যেমন পবিত্র, তোমাকে তেমন পবিত্র থাকিতে হইবে। গঙ্গাজল স্পর্শে যেমন পাপ-বিদূরণ হয়, তোমাকেও তেমন পতিত-পাবনী হইতে হইবে। মৃত্যুকালে গঙ্গা নাম স্মরণ করিয়া যেমন ভক্ত-জীব স্বর্গলোক লাভ করে, তোমাকেও তেমন পুণ্য-মহিমা-শালিনী হইতে হইবে। পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা তোমার জীবনে প্রতিফলিত হওয়া চাই। যিনি নিজে পবিত্র হইতে পারেন, তাঁহার স্পর্শে

অপরাপরেরাও পবিত্রতা লাভ করে। তোমাকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্রতার চরম সীমায় পৌঁছিতে হইবে এবং তোমার সদিচ্ছার দ্বারা, তোমার বিশুদ্ধ বাক্যের দ্বারা, তোমার নির্ম্মল দৃষ্টির দ্বারা এবং তোমার পাতকনাশন সঙ্গের দ্বারা অপবিত্র জীবকে পবিত্রতা-লাভের অধিকারী করিতে হইবে। অবশ্য, তোমার জীবনের পুণ্য-স্রোত প্রধানতঃ নারীজাতির সংসর্গের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইবে।

তুমি তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত কর মা, তুমি তোমার আত্মশক্তিকে বিশ্বাস কর। ভগবান্ তোমাকে বৈধব্য দিয়াছেন কি শুধু-শুধু ? জীবকে কি তিনি শুধু অসহায় করিবার জন্যই দুঃখ দেন ? তাঁহার প্রদত্ত দুঃখগুলি অনেক সময়ই কি আমাদের ভিতরের শক্তিকেই জাগ্রত করিবার জন্য নয় ? দেহ-মনের পূর্ণ বিশুদ্ধতা বজায় রাখা তোমার পক্ষে অসম্ভবও নয়, নিষ্প্রয়োজনও নয়। কিন্তু বর্তমান যুগের নরনারীর মন যে কদর্য্য ধারণার আধার হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে বিবাহিত জীবনে পবিত্রতা রক্ষা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হইত। সধবার সংযম-প্রার্থনার প্রতি কেহই কর্ণপাত করিত না,—বরঞ্চ ভোগ-স্পৃহা-হীনতার জন্য পদে পদে তুমি লাঞ্ছিতা, অবমানিতা ও নিপীড়িতাই হইতে। এই জন্যই তুমি বিধবা,—বৈধব্য তোমার উপর অভিসম্পাত নয় মা, ইহা তোমার উপরে বিধাতার দয়ার দান। ভোগ-পরায়ণা সধবা নারীকুলের উৎসব-সমারোহ দেখিয়া উল্লাস-কলরোল শুনিয়া বিভ্রান্ত হইবার, আত্মাবজ্ঞা করিবার বা নিজেকে অভাগিনী ভাবিবার প্রয়োজন তোমার নাই মা। বাহিরে উৎসব করিলে কি হয় মা, অসংযমের দারুণ-দহনে সধবাকুল কেমন করিয়া যে ভিতরে ভিতরে দগ্ধিয়া মরিতেছে, তাহা যদি জানিতে মা, তাহা হইলে তুমি বিভীষিকায় শিহরিয়া উঠিতে,—উহাদের দারুণ মনস্তাপ, উহাদের হৃদয়ভেদী হাহাকার শুনিলে তোমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। আর, দাম্পত্য জীবনের মধ্য দিয়া তুমি সমাজের যে কল্যাণ করিতে পারিতে, তোমার

জীবনের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমার দ্বারা তাহার অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা হইবে।—এই জন্যই তুমি ব্রত-ধারিণী। তুমি স্বামিহীনা, ইহা তোমার এক দুঃখ, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা তোমাকে পরমকল্যাণের পথেই টানিয়া আনিয়াছে। তোমার বৈধব্য তোমার জন্য আধ্যাত্মিক রাজ্যের সকল শ্রেষ্ঠ সম্পদের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, **ব্রহ্মচর্য্য এবং সংযম তোমার জন্য নিত্যানন্দ-ধাম রচনা করিতেছে**। সংসারের ক্ষুদ্র সুখে মত্ত হইলে যে পরম-সুখকে ভুলিয়া থাকিতে হইত, সেই দেব-দুর্ল্লভ সম্পদ লাভ করিবার সুযোগ আজ তোমার ঘটিয়াছে। ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সুখের লালসায় বদ্ধ থাকিলে যে মুক্তিময় জগতের প্রেমানন্দময় সুখাস্বাদ তোমার পক্ষে অপ্রাপ্য হইত, আজ তোমার সর্ব্বসুখ-বিরহিত, ভোগরিক্ত, পবিত্রতাদীপ্ত বিধবা-জীবন সেই প্রেম ও সেই আনন্দকে লাভ করিবার অধিকতর সুযোগ পাইয়াছে। সধবাজীবনের ইন্দ্রিয়-সেবা তোমাকে যে উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিত, তোমার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, নিষ্করুণ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ সেই উন্নতির পথকে তোমার পক্ষে সহজ করিয়া দিয়াছে। বিধবা-জীবনের সদাচার তোমাকে ধর্ম্মের দিক্ দিয়া, কর্ম্মের দিক্ দিয়া, সাধনার দিক্ দিয়া ও নর-নারায়ণের সেবার দিক্ দিয়া যোগ্যতরা করিয়াছে ; তোমার অন্তর-বাহিরে সকল শক্তিকে প্রখরতর করিয়াছে।

* * * *

তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে,—যেদিন গৃহীর জীবনে শুদ্ধতা সঞ্চারিত হইবে, বিবাহিতা হইয়া নিয়ত স্বামি-সঙ্গে থাকিয়াও স্ত্রীগণের পক্ষে যেদিন পবিত্রতা ও সংযমের সাধনা সম্ভব হইবে, নিশ্চিত জানিও, সেদিন ঘরে ঘরে শোক-দুঃখের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপা বিধবাগণকে আর দেখা যাইবে না। সেইদিন দেখা যাইবে, আশী বৎসর বয়সের সধবা মহিলা কপাল-জোড়া সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া সানন্দে স্বামীর পদ-সেবা করিতেছেন।

বিবাহিত জীবনে যেদিন পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা হইবে, বিবাহিত জীবন হইতে যেদিন পশু-সুলভ ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার নির্ব্বাসন ঘটিবে, সেদিন শমন বা তাহার অনুচরগণ কোনও সধবার গৃহকোণ মাড়াইতে সাহস পাইবে না। আর, যদিই বা কখনও সত্যবান বা লক্ষীন্দরের মত কোনও স্বামী অকালে কালের কবলে নিপতিত হন, তাহা হইলেও সাবিত্রী ও বেহুলার তপস্যার ফলে তাঁহারা পুনর্জ্জীবন লাভ করিবেন। অকালমৃত্যু কেন এত ঘটিতেছে, জান কি মা ? বাল্য ও যৌবনের অসংযমই ইহার প্রধানতম কারণ। অসংযমের খরস্রোত যদি নিবারিত হইতে পারিত, তাহা হইলে কদন্ন খাইয়াও, এক বেলা আহার করিয়াও পুরুষেরা দীর্ঘজীবী হইতে পারিত। আর, পুরুষদিগকে দীর্ঘজীবী করিতে পারিলেই বিধবার সংখ্যাও কমিয়া যাইত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে,—বিবাহিতা নারীর পক্ষেও পরম সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ সুলভ্য হইতে পারে, যদি তাহার বিবাহিত জীবন সংযমের দ্বারা শাসিত হয়। সধবা নারীও নিত্যানন্দ-ধামে প্রবেশের অধিকারিণী হইতে পারে, যদি ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা তাহার জীবনকে গ্রাস করিয়া না ফেলে। কিন্তু, নৈতিক অবনতির এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে কয়জন সধবা সংযমের পথে চলিতে চাহিলেও চলিতে পারেন ? সর্ব্বশাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন,—“যেখানে ভোগের রাজত্ব, সেখানে ভগবানকে লাভ করা যায় না।” সকল দেশের সকল ঋষি-মহর্ষিরা সমস্বরে বলিতেছেন,—“ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত পরমসুখ বা ভূমানন্দকে কেহ পাইতে পারে না।” ভোগ-পথের পথিকেরা সুখের দুরাশায় প্রবৃত্তির অনলে ঝাঁপ দিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া ঠেকিয়া শিখিয়া মানব মানবীবৃন্দকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য তারস্বরে বলিতেছে—“বিষয় বাসনার চরিতার্থতার লোভ পরমানন্দ লাভের প্রবল বিঘ্ন।” কিন্তু বল দেখি মা, কয়টী বিবাহিতা নারী দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে সংযমকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছে ? বিবাহিত নর-নারীর

মধ্যে মিতাচার প্রতিষ্ঠার জন্য পারিবারিক জীবনে যে সকল সদাচারের অনুশীলন আবশ্যক, কোনও গৃহে তাহা অনুসৃত হইতেছে কি ?

সুতরাং বৈধব্যকে তুমি দুঃখ বলিয়া কল্পনা করিয়া বিমর্ষ হইও না ; ইহাকে তোমার সংযম-সাধনার সুযোগরূপে গ্রহণ কর এবং দৃঢ়-বীর্য্য সহকারে সাধন-ভজনের কল্যাণময় পথে অগ্রসর হও। প্রবৃত্তি পরিচালনা-রূপ হীনসুখের লোভে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিজেদের জীবনকে ক্লেদ-দুর্গন্ধ-পঙ্কিল এবং বিষাক্ত করিয়াছে,—তুমি আজ বৈধব্যকে ইন্দ্রিয়-সংযমের অপূর্ব্ব সুযোগ জানিয়া কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা হও এবং ত্যাগের অমৃতময় মাধুর্য্য দিয়া তোমার জীবনকে স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত এবং দুঃখশোকাতীত করিয়া লও। বৈধব্য তোমার জীবনের পক্ষে পরম-রত্নকে সুলভ করিয়াছে, পরমাত্মাকে সুপ্রাপ্য করিয়াছে। ভোগ-সুখ-রতা রমণীর পক্ষে যাহা কল্পনারও অতীত, তোমার পক্ষে তাহা অতীব সহজলভ্য। **বিলাস-পরায়ণা ইন্দ্রিয়-সুখ-লুব্ধা তামসিকী নারীর পক্ষে যে মহাসম্পদ বহু জন্মের তপস্যার ফলেও অলভ্য, তোমার পক্ষে তাহা ইচ্ছা মাত্রেই প্রাপ্তব্য।** সুতরাং প্রচণ্ড উৎসাহ সহকারে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হও মা। নিজেকে সর্ব্বশক্তিময়ী বলিয়া বিশ্বাস কর এবং রণচণ্ডিকার বিক্রমে সাধন-সমরে অবতীর্ণা হও মা। মনে রাখিও, **শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাই তোমার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের চরম সিদ্ধি। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছ, এ'বারেই এই দেহটাকে পরম গৌরব দান করিতে হইবে, শত শত জন্মের জন্য অপেক্ষা করিলে চলিবে না, এই জন্মেই ভগবানকে পাওয়া চাই।** এই তীব্র সঙ্কল্প লইয়া তীব্রতর অধ্যবসায়ের সহিত ভগবানের পরমমঙ্গল মহানামের সাধনায় অবহিতচিত্ত হও।

নাম-সাধনের ফলে তোমার মধ্যে নিত্য নবভাবের উন্মেষ হইবে। এক এক সময়ে ভগবান্ এক এক রূপ ধরিয়া তোমার নিকটে আত্মপ্রকাশ করিবেন। নাম-সাধন করিতে করিতে কখনও দেখিবে, তিনি তোমার প্রভু, তুমি তাঁহার আজ্ঞা-প্রতিপালন-কারিণী চিরদাসী, তাঁহার প্রীতি ও সেবাই তোমার পরম সাধনা। কখনও দেখিবে, তিনি তোমার সখী, তিনি তোমার হৃদয়ের সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী, তোমার চিত্তরঞ্জিনী। কখনও দেখিবে, তিনি তোমার সন্তান, তোমার বুকজুড়ান ধন, তোমার আদর-স্নেহের নিত্যনিকেতন। কখনও দেখিবে, তিনি তোমার জননী, তোমার স্তন্যদায়িনী, তোমার ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল পরিবেশনকারিণী, তোমার রোগ ও বেদনার কালে স্নেহমাখা-ক্রোড়বিধায়িনী। কখনও দেখিবে, তিনি তোমার প্রাণেরও প্রাণ, হৃদয়েরও হৃদয়, আত্মারও আত্মা, তিনি তোমার জীবন–সর্ব্বস্ব, তিনি তোমার সর্ব্বেশ্বর। কখনও দেখিবে তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকলের অন্তর, তিনি সকলের বাহির, তিনি সর্ব্বভূতে, তিনি নিত্য ও অক্ষয়, তিনি তোমাতে, তুমি তাঁহাতে এবং তুমিও তিনি এক–অভিন্ন। এইরূপ নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া তোমার ভগবৎ-সাধনার পরিস্ফুটন ঘটিবে। নামে লাগিয়া থাক, মনের সকল বিক্ষিপ্ততাকে বশীভূত করিয়া নাম-সেবাতেই ডুবিয়া যাও,–নামের বলেই সকল উন্নত অবস্থাগুলি আপনি আসিবে। তোমার ন্যায় শত শত আশ্রয়হীনা অনাথা নারী নাম-সাধনের বলে যাহা লাভ করিয়াছে, তুমিও অবশ্যই তাহা লাভ করিতে পারিবে। চাই শুধু একাগ্র প্রয়াস, চাই শুধু অক্লান্ত অধ্যবসায়। বিশ্বজগৎ কামের বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তুমি আজ নাম-সাধনের বলে প্রেমের মহাসমুদ্রে নিমজ্জমানা হও। ✻✻✻ ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চম পত্র

ওঁ তৎসৎ

কলিকাতা
১১ই ভাদ্র, ১৩৩৪

নিত্যনিরাপদাসু ঃ–

মা ❋❋❋ বিধবা-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ হইল তাহার নিঃসঙ্গতা। অর্থকষ্ট, পারিবারিক অত্যাচার, রোগের যন্ত্রণা প্রভৃতি সকল দুঃখকেই মানুষ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে–যদি একজন ব্যথার ব্যথী কেহ থাকে। বিজন অরণ্যে বা অমাবস্যার শ্মশানেও মানুষ ভয়কে দমন করিতে পারে, যদি সঙ্গে অন্ততঃ একটি ক্ষুদ্র শিশুও থাকে। কিন্তু যাহাকে একাকী বাস করিতে হয়, তাহার কাছে ধন-সম্পদ, স্বাধীনতা, আরোগ্য এবং সুখ-বিলাসও বৃথা মনে হয়। লক্ষ মুদ্রা পাইবার লোভেও কেহ জনহীন দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইতে চাহে না, পরন্তু নিয়ত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা এবং অত্যাচার সহ্য করিয়াও একজন দরদের দরদীর সহিত বাস করিতে পারে। সঙ্গে একটি হৃদয়ের জন থাকিলে মানুষ অনাহার-ক্লেশকেও ক্লেশ মনে করে না, অনিদ্রার অস্বস্তিকেও অস্বস্তি বলিয়া গণনায় আনে না। এই সঙ্গপ্রিয়তা মানুষের স্বভাব,–শুধু মানুষের নয়, অনেক জীব-জন্তুরও স্বভাব। সঙ্গপ্রিয়তা মানুষের মজ্জাগত সংস্কার।

কিন্তু, বিধবার জীবন সঙ্গহীনতার অভিসম্পাতে অভিশপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র সমাজের তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রসারের সহিত বিধবার জীবনের কোনও যোগ নাই। সামাজিক জীবনের উৎসাহ আনন্দগুলির মধ্যে বিধবার কোনও শ্লাঘনীয় স্থান নাই। তাহার হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইবার বান্ধব কেহ নাই। সধবারা তাহাকে প্রকারান্তরে অস্পৃশ্যাই মনে করে, তাহার ছায়াকে দুর্ভাগ্যপ্রদ বলিয়া সযত্নে পরিহার করে। পুরুষেরাও বিধবাদের প্রতি একান্তই উপেক্ষাশীল।

ফলতঃ বিধবার বুকভরা দুঃখ ও প্রাণভরা বেদনা বুঝিবার জন্য এ জগতে কেহ নাই। তাহার বিষাদ-কালিমাচ্ছন্ন ম্লান মুখপানে সহানুভূতির

নয়নে তাকাইয়া দেখিবার কেহ নাই। মৌনভাবে নতমস্তকে সে যে কত বড় দণ্ড সহিতেছে, ইহা বিবেচনা করিবার মত বিচারপরায়ণতা বা সহৃদয়তা কাহারও নাই। তাহার স্বামীর অকাল-মৃত্যুর জন্য যে সে দায়ী নহে, ইহা বুঝিবার মত দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন কেহ নাই। পুরুষ-জাতির মধ্যে যে অকালমৃত্যু দিনের পর দিন আতঙ্ক-জনক ভাবে প্রবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার জন্য ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ পুরুষজাতিই যে অপরাধী, এ কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিবার মত সৎসাহস কাহারও নাই। পুরুষ কেন অকালে মরিল, ইহার প্রতিশোধটা তাহার নিরপরাধা বিধবার উপর দিয়া তোলা হয়। কোনও সংসারে বিধবা-নারী সকলের বাধ্যকরী দাসী, কোনও সংসারে বা সকলের অত্যাচার-নিপুণতার প্রয়োগক্ষেত্র। ব্যথা দিলেও বিধবার চোখে জল আসিতে পারিবে না, লাথি মারিলেও সে আর্ত্তনাদ করিতে পারিবে না, হাত পা বাঁধিয়া দুই চারিদিন অন্ধ কুঠরীতে ফেলিয়া রাখিলেও সে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না! কেন সে স্বামীর মাথা খাইল ? কেন সে স্বামীর বদলে নিজে মরিতে পারিল না ? নিজের প্রাণ দিয়া কেন সে তাহার বিপত্নীক স্বামীকে আর একটী কমল-পত্রাক্ষী তরুণীকে বিবাহ করিয়া পুরুষ-জন্ম সার্থক করিতে দিল না ?

ইহাই হইল বিধবার নিকটে বর্ত্তমান একচক্ষু সমাজের অসহিষ্ণু প্রশ্ন। কেহ ত' একথা বুঝিতে যাইবে না যে, স্ত্রী মরিতে চাহিলে কি হয়, সত্যবান্ ও লক্ষ্মীন্দরের মত বাঁচিবার যোগ্যতা না থাকিলে ত' আর স্বামী বাঁচিয়া উঠিতে পারে না। সে যুগে বাল্যজীবনের ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল, কৈশোরে তীব্রভাবে সংযম-সাধনের সুযোগ ছিল, কৃতকর্ম্মের দ্বারা বিবাহের পূর্ব্বেই সমগ্র আয়ুটুকুকে পুরুষেরা ধ্বংস করিত না ; তাই অকাল-মৃত্যুও অসম্ভব ছিল। আজ যে সেই অবস্থাটী নাই, বিবাহের পূর্ব্বেই যে পুরুষ-জাতি ঘুণে-ধরা বাঁশের মত অকর্ম্মণ্য ও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, সে কথা এই বুদ্ধিমানের দল বুঝিতেই পারেন না। তাই, আজ বিধবার জীবন পরম-দুঃখিনীর জীবন, তাই আজ ঘরে ঘরে ঝাঁটার দ্বারাই বিধবার নিত্য-সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিধবার জীবন ত' ঘৃণিত জীবন নহে, দুঃখই ত' তাহার একমাত্র প্রাপ্য নহে। তাহার জীবন যে সংশিত-ব্রত ব্রহ্মচারিণীর জীবন, তাহার জীবন যে সন্ন্যাসিনীর তপঃশুদ্ধ জীবন, এই জীবনে যে অপবিত্রতার প্রবেশাধিকার নাই, এ জীবন যে অসংযম-বর্জ্জিত। এ জীবনের মধ্যে প্রাচীন যুগের ঋষি-মহর্ষিগণের সকল তপস্যার মহনীয় গৌরব আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে। অপর সকল নরনারী যখন কাম-চর্চ্চায়, ইন্দ্রিয়-বিলাসে গা' ঢালিয়া দিয়া নরকের পথে অগ্রসর হয়, বিধবা তখন তাহার সংযমের বলে ভগবানকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। অপরে যখন শতবার চীৎকার করিয়া, সহস্র ডাকাডাকি করিয়া শেষে ভগবান্ নাই বলিয়া মনকে মিথ্যা সান্ত্বনায় ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে যত্ন পায়, সংযম-ব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণী বিধবা তখন ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, ভগবানের শ্রীঅঙ্গের পরম পরশ লাভ করিয়া, তাঁহার মধুময় কণ্ঠের অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া কোটি জন্মের পিপাসা মিটায়। সংযমের সাধনাই এই অঘটনকে ঘটায়, এই অসম্ভবকে সম্ভব করে, এই দুর্ল্লভকে সুলভ করে। যাহার জীবনে সংযম নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই, তাহার শতবারের প্রয়াসও ভোগ-সুখ-ত্যাগীর এক বারের প্রয়াসের সমকক্ষ ফল আহরণ করিতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মচর্য্যই সকল তপস্যার মূল, ইন্দ্রিয়-সংযমই সকল সাধনার ভিত্তি।—এই জন্যই বিধবার পক্ষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ অপরের অপেক্ষা বহুগুণে সহজ।

কিন্তু হায় ! অতি অল্প সংসারেই বিধবা তাহার ব্রহ্মচর্য্যের যোগ্য পদবী ও সম্মান লাভ করিয়া থাকে। যে সকল স্থলে বিধবা তাহার পবিত্র ব্রত হইতে স্খলিত হইতেছে, আমি মনে করি, সর্ব্বসাধারণের এই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্থলে প্রধানতম কারণ। যে কাহারও মিত্রতা পায় না, মিত্রতা লাভের জন্য নিয়ত তাহার মন ব্যাকুলতা অনুভব করে। কেহ যাহাকে আদর করে না, একটুখানি নগণ্য আদরের জন্য তাহার মন-প্রাণ অজানার পানে উন্মুখ হইয়া থাকে। মূল্য জগতে একজনও স্বীকার করে না, যে-কেহ তাহাকে একটুখানি মূল্যবান্ মনে করুক, এই

আকিঞ্চন তাহার হৃদয় জুড়িয়া বিরাজ করে। যে কাহারও প্রেম পায় নাই, সে তুচ্ছ একটুকু স্নেহের জন্যও নিজেকে নিতান্ত লালায়িত অনুভব করে। ইহারই ফলে অনেক বালিকা ছলনাকে সত্য বলিয়া ভাবে, বিষকে অমৃত বলিয়া মনে করে, চিরদুঃখের পথকে সুখপ্রদ বলিয়া ভ্রান্ত হয়।

তোমাদের মত পরিণাম-চিন্তাপরায়ণা বিবেকবতী বিধবাদের পক্ষে এই সকল অবোধা বালিকাদের কল্যাণার্থে আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন আছে। যেরূপ সৎসাহস থাকিলে অনাথা বিধবাও নির্ভয়ে হিংস্র-জন্তু-সমাকুল জনারণ্যের মধ্যে দিয়া কর্ত্তব্যের পথ সবল-চরণে অতিক্রম করিতে পারে, সেই সৎসাহসকে এই সকল সরলহৃদয়া সংসারে-অনভিজ্ঞা বিধবাদের মধ্যে সৃষ্ট ও পুষ্ট করিবার জন্য তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমতী এবং সাধনবতী বিধবাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। বিপথে চলিয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা সুপথে থাকিয়া মরণও ভাল, এ' কথা মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া দিবার জন্য আজ তোমাদের প্রয়োজন আছে। মানুষের মূর্ত্তিতে যত লোক তোমাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জানিও মা, ইহাদের অধিকাংশের প্রকৃত মূর্ত্তিটা পশুর, যথার্থ মানুষ অতি অল্পই আছে। মানুষের খোলস গায়ে দিয়া তোমার চারিদিকে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, মহিষ, শৃগাল, কুক্কুর এবং ছাগলের পালই বিচরণ করিতেছে। কে কোন্‌দিক দিয়া কাহার সর্ব্বনাশ করিবে, ইহারা তাহারই ফিকির খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কেহ বন্ধুভাবে, কেহ হিতৈষীভাবে, কেহ প্রতিপালকভাবে, কেহ সাহায্যদাতাভাবে, কেহ উপদেষ্টাভাবে, কেহ বা আশ্রয়দাতার ছদ্মবেশ পরিয়া ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করিয়া পরিশেষে মস্তকে লগুড়াঘাত করিবার ফন্দিতে রহিয়াছে। কেহ শাস্ত্রের কথা কহিয়া, কেহ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া, কেহ বা মুনি-ঋষির নামের দোহাই দিয়া বিশ্বাস ও নৈকট্য জন্মাইতেছে এবং প্রথম সুযোগেই দস্যুবৃত্তি করিবার জন্য হাতিয়ার লইয়া প্রস্তুত হইতেছে। কেহ সততার অভিনয় করিয়া, কেহ ফোঁটা-তিলকে ভুলাইয়া, কেহ বা বচনের বাহারে আকৃষ্ট করিয়া নিজেদের মনোগত দুরভিসন্ধি পূরণের অবসর অন্বেষণ করিতেছে।

ব্যাঘ্র-কুম্ভীর অপেক্ষাও অতি-ভয়ঙ্কর এই সকল নরাকৃতি পশুকুলের গভীর চক্রান্ত হইতে সরলা অবলা বিধবাকে রক্ষা করিবার জন্য কি কোনও উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে না মা ? যৌবনের স্ফুরণের আগেই অথবা প্রারম্ভেই যাহার স্বামি-বিয়োগ হইয়াছে, তাহার বৈধব্যের পবিত্রতা ত' পদে পদে বিপন্ন! ভালবাসিবার জন্য, বুকে রাখিবার জন্য, আদর-সোহাগ করিবার জন্য একটী সন্তানও যাহার নাই, মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার লোক নাই, উদরান্নের জন্য যাহাকে নিঃসম্পর্কীয় অনাত্মীয়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে হয়, পরের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের অপেক্ষা করিতে হয়, তাহারই বা ধর্ম্ম কোথায় ? ইহাদের জন্যও কি কোনও উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে না ? আবার, যে বিধবার অভিভাবক আছে কিন্তু তাহারা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও অসংযমী, যে বিধবার আত্মীয়-পরিজন আছে কিন্তু তাহারা ভোগ-লোলুপ ও আত্মসুখী, যে বিধবার স্বজন-বান্ধব আছে কিন্তু তাহারা বিলাস-ব্যসনাসক্ত, বাসনা-কাতর ও লম্পট, সেইখানেই বা বিধবার বিপদের অন্ত কোথায় ? যেখানে বিধবা কুমারী-জীবনে সুশিক্ষা পায় নাই, সধবা-জীবনে সংযমের সাক্ষাৎকার পায় নাই এবং দুঃখময় বিধবা-জীবনেও সৎসঙ্গ পাইতেছে না, সেইখানেই বা বিধবার রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা কোথায় ? ইহাদের জন্যও কি কোনও সদুপায় আবিষ্কার করিতে হইবে না ? সত্য বটে, বিধবার পুনর্ব্বিবাহের বিধি শাস্ত্রে আছে ; সত্য বটে, বর্ত্তমানে বহু বিধবা-বালিকা ও যুবতী পুনরায় বিবাহিতা হইতেছে ; সত্য বটে, ভবিষ্যতেও অসংখ্য বিধবা এক স্বামীর মৃত্যুর পরে পত্যন্তর গ্রহণ করিবে, কিন্তু দেশের সকল বিধবাই যে পুনর্ব্বিবাহের জন্য অগ্রসর হইবে, এমন ভয়ঙ্কর দিন ত' এদেশে কখনও আসিবে না ! এই রকম দুর্দ্দিনের কথা আমি কখনও কল্পনাও করিতে পারি না। এমন দুঃসময় যদি ভারতবর্ষে কখনও আসে, তাহা হইলে এদেশের মনুষ্যত্বের একটা বিরাট অংশ বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। মনুষ্যত্বের এই ধ্বংসকে মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া

লইতে দেশ কখনও সম্মত হইবে না। কিন্তু তখন বিধবাকুলের মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম ও পবিত্রতাকে অটুট ও অক্ষত রাখিবার জন্য কোন্ আয়োজন করিতে হইবে ?

এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর সেই তোমাদিগকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহারা বিধবা-জীবনের সকল দুঃখ, শোক, দুর্গতি, বিপদ ও প্রলোভনের মধ্য দিয়া জয়-গৌরব পথ চলিতে পারিতেছ। যাহারা বৈধব্য-ধর্ম্ম প্রতিপালনের লোক দেখান অভিনয় করিয়া বাহিরের শুভ্র বস্ত্র দিয়া অন্তরের পাপকে গোপন করিয়াছে, ইহা তাহাদের কর্ম্ম নহে। যে সকল বিধবা নিজেদিগকে সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে অক্ষম জানিয়া পুনর্ব্বিবাহ করিয়া নূতন করিয়া সংসারী পাতিতে বাধ্য হইয়াছে, ইহা তাহাদেরও কর্ম্ম নহে। এমন কি, ইহা পুরুষ-জাতির কর্ম্ম নহে। ইহা তোমাদেরই কর্ম্ম, এ কর্ম্ম তোমাদেরই সাজিবে,—অন্য লোকের পক্ষে ইহা অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র হইবে।

কিন্তু এক দিনেই এই প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে, ইহা মনে করি না। মন অতি আশ্চর্য্য বস্তু। ইহার উপরে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার। নিমেষের মধ্যে সংযত মন অসংযত হইয়া যায়, শান্ত মন অশান্ত হয়, ভোগ-বিমুখ মন ভোগ-লুব্ধ হয়, ত্যাগ-পরায়ণ মন লালসা-চঞ্চল হয়,—ইহা মনের এক অদ্ভুত স্বভাব। এই মনকে সর্ব্বদা একদিকে রাখা, কু-বিষয় হইতে টানিয়া নিয়ত সু-বিষয়ে নিয়োজিত করা, উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা হইতে রক্ষা করিয়া সুশৃঙ্খল ও সুসংযত রাখাও এক অদ্ভুত ব্যাপার। ব্রহ্মশক্তির অধিকারিণী না হইলে কেহ কখনও মনের উপরে প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে না। কারণ, মদমত্ত ঐরাবতকে দমন করা সহজ, কিন্তু উত্তেজিত উদ্দাম ভোগোন্মত্ত মনোবৃত্তিকে দমন করা সহজ নহে। বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, পরাশর প্রভৃতি উগ্রতপা মুনি-ঋষিরাও কত সময়ে মনকে শাসনে রাখিতে না পারিয়া ব্রহ্মচ্যুত এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, কাম-

দমন সহজ কথা নহে। কামের প্ররোচনায় হিতাহিত-জ্ঞান-বর্জ্জিত কত দুর্ভাগা ও দুর্ভাগিনী যে নিজেদের জীবনের গৌরবকে ধ্বংস করিয়াছে, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছে, ধর্ম্ম-ধনকে পদদলিত করিয়াছে, ক্ষণিক সুখের মিথ্যা লোভে ইহকালে ও পরকালে অনন্ত দুঃখ সঞ্চয় করিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? কাম-মোহে অভিভূত হইয়া কত নরনারী যে কাঞ্চন-ভ্রমে কাচ কিনিয়াছে, সামান্য প্রলোভনকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া কত নরনারী যে অনন্ত নরকে নিপতিত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা-নির্দ্ধারণ করিবে ? কিন্তু জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ অসম্ভব নয় ! বরঞ্চ ইহা লাভ করা প্রত্যেক মানুষেরই পক্ষে সম্ভব। যে মানুষ উপযুক্ত চেষ্টা পাইতে অনিচ্ছুক নহে, প্রাণপণ উৎসাহ সহকারে আত্মদমন করিতে পরাঙ্মুখ নহে, দৃঢ়বীর্য্য সহকারে যে ব্যক্তি ভগবানের কৃপাকে ব্রহ্মচর্য্যের মূলদেশে স্থাপিত করিতে অধ্যবসায়ী হয়, তাহার পক্ষে মনের উপরে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আয়ত্ত করা আদৌ অসম্ভব নহে। তবে, নিজের শক্তিতে কেহ কখনও জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে না,—ভগবৎ-শক্তিই এই বিষয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা এবং নিজ জীবনের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির স্ফুরণের জন্য পদ্ধতিবদ্ধ সাধনাই একমাত্র অবলম্বন। ব্রহ্মকৃপাই এই বিষয়ে পরম নির্ভর,—এবং ধারাবাহিক প্রযত্নে নিয়ত ভগবৎ-পাদপদ্মের স্মরণ ও মননই তাঁহার কৃপালাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

যে বিধবার মনে চঞ্চলতা আছে অথচ গৌরবময় বৈধব্যব্রত পালন করিতে যাহার একান্ত অভিরুচি, তাহার পক্ষে শ্রীভগবান্ ব্যতীত ধর্ম্ম-রক্ষার সহায় আর কে আছে মা ? একমাত্র ভগবৎ-কৃপাই তাহার সর্ব্বাবস্থার সহায়, ভগবৎ-কৃপাই তাহার সকল বিঘ্ন-বিপদের পরিত্রাতা। পার্থিব দুঃখে সে বিচলিত হয় না, বন্ধু-বেশধারী শত্রুর সহায়তা সে চায় না, ভগবৎ-কৃপাই তাহাকে দুঃখাতীত করে। পারিবারিক অত্যাচারে সে অভিভূত হয় না, সহানুভূতি পাইবার জন্য সে অপরের নিকটে যায় না, একমাত্র ভগবৎ-কৃপাই তাহার প্রকৃত

পন্থা নির্দ্দেশ করে। মানব-সুলভ সংসর্গপ্রিয়তা-হেতু সে নর-দেহধারী হিংস্রজন্তুদের কবলে পতিত হয় না,—ভগবানের নামের মধ্যেই সে তাহার প্রাণমনোহারী সুখ-সঙ্গ প্রাপ্ত হয়। নিজের জীবনের একাকিত্বে পিষ্ট হইয়া সে নিজ হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইবার জন্য অন্য কোনও মানুষকে মনে মনে খুঁজিয়া বেড়ায় না, ভগবানের সঙ্গেই সে হৃদয়-বিনিময় করে, ভগবানের সঙ্গেই সে মালা-বদল করে, ভগবানের সঙ্গেই সে প্রেমের মধুময় সম্পর্ক পাতাইয়া লয়। ভালবাসিবার জন্য সে তখন ভগবানকে পায়, প্রলোভনের দিক্ হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভগবানের অপরিসীম আকর্ষণকে পায়। কাম-দমন তখন তাহার পক্ষে আর কঠিন হয় না। ভগবান্ তখন তাহার পরম-প্রেমাধার জীবন-স্বামী, আর জগৎবাসী যাবতীয় নরনারী তাহার পুত্র ও কন্যা ! জগৎ-ব্যাপিয়া তখন তাহার মাতৃ-স্নেহের পীযূষ-প্রবাহ মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় বহিতে থাকে—কাম-মোহ তাহাতে ভাসিয়া যায়। তখন বিধবা-নারী জগতের জননী-রূপিণী, সকলের পূজার্হা ও বন্দনীয়া। তখন তাহার সংযমের ভাণ্ডার অফুরন্ত, পবিত্রতার ভাণ্ডার অফুরন্ত, ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার অফুরন্ত। নিজের বলে যে অপূর্ব্ব অবস্থা কেহ কখনও লাভ করিতে পারে নাই, অসহায়া দুর্ব্বলা, দুঃখ-নিপীড়িতা, চির-উপেক্ষিতা, বিধবা-নারী একমাত্র ভগবানের কৃপা-বলে তখন সেই সংযম, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, নিষ্কামতা এবং ধীরত্বকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং আজ বিধবাদের কল্যাণার্থে এমন ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ভগবৎ-কৃপা লাভের যোগ্যা হইতে যত্নবতী হয়।

অদ্য আর অধিক লিখিব না। তোমার অপরাপর প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর ধীরে ধীরে দিব। ✻✻✻ মা, নিজের উপরে বিশ্বাস কখনও হারাইও না। নিজেকে কখনও ছোট বলিয়া ভাবিও না। ভারতবর্ষ ক্রমশঃ জাগরণ লাভ করিতেছে। এই জাগরণ-পর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী বিধবাদের করিবার মত কাজ যথেষ্ট আছে এবং কাজ করিবার মত সুযোগও ক্রমশঃ

সৃষ্ট হইবে। বিধবার জীবন শুদ্ধতপা সন্ন্যাসীর সিদ্ধ-জীবনের ন্যায় সকলের নিকটে দিব্য সম্মান পাইবার জন্য শুধু অপেক্ষা করিতেছে। তোমাদের মধ্য হইতে কল্যাণময়ী প্রতিভার বিকাশের সাথে সাথে তোমরা তোমাদের প্রাপ্য সিংহাসন লাভ করিবে। *** ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠ পত্র

বন্দে মাতরম্

কলিকাতা

২৫শে ভাদ্র, ১৩৩৪

শুভাশীর্ভাজিনীসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছি *** ব্রহ্মচর্য্যের সহিত একনিষ্ঠ ভগবৎ-সাধন থাকিলে না করা যায়, এমন কাজ এ জগতে নাই। তুমিও সবই পারিবে। নিয়ত আশান্বিতা হও এবং নিজের শক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করিতে চেষ্টাবতী থাক।

আমার পত্রগুলির ভাষা একটু কঠিন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু মনোযোগ দিয়া পড়িলেই এগুলির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে। একবারে বুঝিতে না পার, বারংবার পড়িও।

একটা পাড়ার মধ্যেই আঠারটী অশিক্ষিতা বিধবার অস্তিত্ব যে কত-বড় একটা মর্ম্মবেদনাদায়ক সংবাদ, তাহা বুঝাইবার ভাষা পাই না। বিধবা-মহিলা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছে দেখিলে প্রাণে আনন্দ পাই, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-পালনের উপযুক্ত সুশিক্ষা যাহারা পায় নাই এবং পাইতেছে না, তাহাদের মধ্যে বৈধব্যের এইরূপ আধিক্য দেখিলে শুধু যে বেদনা-কাতরই হই, তাহা নহে, পরন্তু আতঙ্কগ্রস্তও হই। মহাত্মা গান্ধীর মতন ব্রহ্মচর্য্য-সমর্থক ব্যক্তিও কেন যে বালবিধবাদের পুনর্বিবাহকে এত জোরের সহিত সমর্থন করেন, তাহার কারণ তখন বুঝিতে পারি। একদল

সৃষ্ট হইবে। বিধবার জীবন শুদ্ধতপা সন্ন্যাসীর সিদ্ধ-জীবনের ন্যায় সকলের নিকটে দিব্য সম্মান পাইবার জন্য শুধু অপেক্ষা করিতেছে। তোমাদের মধ্য হইতে কল্যাণময়ী প্রতিভার বিকাশের সাথে সাথে তোমরা তোমাদের প্রাপ্য সিংহাসন লাভ করিবে। ❋❋❋ ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠ পত্র

বন্দে মাতরম্ কলিকাতা

২৫শে ভাদ্র, ১৩৩৪

শুভাশীর্ব্বাজিনীসু ঃ–

স্নেহের মা, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছি *** ব্রহ্মচর্য্যের সহিত একনিষ্ঠ ভগবৎ-সাধন থাকিলে না করা যায়, এমন কাজ এ জগতে নাই। তুমিও সবই পারিবে। নিয়ত আশান্বিতা হও এবং নিজের শক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করিতে চেষ্টাবতী থাক।

আমার পত্রগুলির ভাষা একটু কঠিন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু মনোযোগ দিয়া পড়িলেই এগুলির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে। একবারে বুঝিতে না পার, বারংবার পড়িও।

একটা পাড়ার মধ্যেই আঠারটী অশিক্ষিতা বিধবার অস্তিত্ব যে কত-বড় একটা মর্ম্মবেদনাদায়ক সংবাদ, তাহা বুঝাইবার ভাষা পাই না। বিধবা-মহিলা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছে দেখিলে প্রাণে আনন্দ পাই, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-পালনের উপযুক্ত সুশিক্ষা যাহারা পায় নাই এবং পাইতেছে না, তাহাদের মধ্যে বৈধব্যের এইরূপ আধিক্য দেখিলে শুধু যে বেদনা-কাতরই হই, তাহা নহে, পরন্তু আতঙ্কগ্রস্তও হই। মহাত্মা গান্ধীর মতন ব্রহ্মচর্য্য-সমর্থক ব্যক্তিও কেন যে বালবিধবাদের পুনর্ব্বিবাহকে এত জোরের সহিত সমর্থন করেন, তাহার কারণ তখন বুঝিতে পারি। একদল

মহাপ্রাণ লোক আছেন, যাঁহারা বিধবাদের দুঃখ দেখিয়া সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিয়া থাকেন,-মহাত্মা গান্ধী সেই শ্রেণীর লোক নহেন। পরন্তু দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর বিধবার অপরিসীম দুঃখ দেখিয়াই বিধবা-বিবাহ চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,-তাঁহার কুসুম-কোমল হৃদয়ে বিধবার প্রানের বেদনা বড় বিষম আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মনের গতি অন্যরূপ। তিনি জানেন যে, দুঃখ ছাড়া কেহ কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। সুতরাং দুঃখের খাতিরে কাহাকেও বিধিবদ্ধ ও চিরাচরিত ব্রহ্মচর্য্য হইতে রেহাই দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের যাহারা অনধিকারিণী, তাহারা যদি ব্রহ্মচর্য্যের অভিনয় করিয়া বেড়ায়, বাহিরের ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের ঠাট্‌টুকু বজায় রাখিয়া ভিতরে ভিতরে পাপের পঙ্কিল-সলিলে অবগাহন করে, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাই, দয়া যাঁহার হৃদয়কে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারিত না, সামাজিক অকল্যাণের আশঙ্কা তাঁহাকে একেবারে মহাব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী বারবার বিধবা-বিবাহের সমর্থন করিয়াছেন। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং গান্ধীজী এতদুভয়ের মধ্যপন্থী। কোন কোন বিধবার দুঃখ দেখিলেই আমি মর্ম্ম-যাতনায় অভিভূত হই, কোন কোন বিধবার বৈধব্য-ব্রত দেখিলে আমি নানা আতঙ্কে অস্থির হই। যে বিধবার মধ্য দিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্ফুরণ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করি, তাহার দুঃখ দেখিলে আমি কাতর হই না ; কেননা, আমি নিশ্চিতরূপে জানি, দুঃখ তাহার জীবনে স্পর্শ-মণির কাজ করিবে, তাহার চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে সংশোধিত করিবে, তাহার ভিতরের প্রকৃত মহত্ত্বকে পূর্ণরূপে বিকশিত করিবে। সংযম-সাধনার অনুকূল আন্তরিক অবস্থা যাহার আছে বলিয়া মনে করি, তাহার যদি চারিদিকেও প্রলোভন ঘুরিয়া বেড়ায়, লালসার জাল ছড়াইয়া থাকে, তাহার যদি রূপ-যৌবন

সর্ব্বাঙ্গ ছাপিয়াও পড়ে, তাহার যদি সৎসংসর্গের অভাবও ঘটে, তথাপি আমি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হই না,–যেহেতু আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, সতীত্বের অগ্নি যদি কাহারও ভিতরে প্রকৃতই জ্বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সপ্তসমুদ্রের জলেও তাহা নিবিতে পারে না। কিন্তু যাহারা দুঃখের মহিমাকে জানে না, দুঃখ পাইয়া জীবনগঠনের সুযোগ তাহারা অতি অল্পই পায়। দুঃখ যে মনুষ্যত্বেরই উন্মেষ ও উপচয়ের জন্য, অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ গুণরাজি ও শক্তিনিচয়ের বিকাশ সাধন করিতে হইলে দুঃখ যে অবশ্যই সহিতে হয়, দুঃখের সংঘাত না পাইলে মানুষ যে নিজের সবলতা ও দুর্ব্বলতাগুলির প্রকৃত স্বরূপ ধরিতে পারে না, এই দৃঢ় প্রত্যয় যাহার জন্মে নাই, দুঃখের ভিতর দিয়া সে মহৎ হইবে কি করিয়া ? আবার, সংযম-সাধনার অনুকূল আভ্যন্তরিক অবস্থাই বা কি করিয়া সৃষ্ট হইতে পারে, যদি বিধবাকে কখনও সংযমের মহিমার কথা উৎকৃষ্ট-রূপে বুঝিতে দেওয়া না হয় ? সংযমের মহিমাকে যে জানিয়াছে, সেই ত' প্রলোভনকে জয় করিতে পারে, অপরে ত' পারে না। সংযমের মহিমাকে যে বুঝিয়াছে, সেই ত' নিজের যৌবনসুলভ নানা চঞ্চলতা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে, অন্যে ত' পারে না ! সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত বিধবাদের সুশিক্ষা সুপ্রচারিত না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত বিধবারা জীবনে দুঃখপ্রাপ্তির মূল্যকে বুঝিতে পারিবে বলিয়া মনে করি না, অথবা সংযম-সাধনার প্রকৃত মহিমাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে আত্ম দমনে সমর্থ হইবে, তাহাও বিশ্বাস করি না। মোহের বশীভূত হইয়া কদাচারে আসক্ত হওয়া অপেক্ষা সকল প্রবৃত্তি দমন করিয়া দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা সম্যক্‌রূপে অক্ষুণ্ন রাখা যে যথার্থই শ্রেষ্ঠ, তাহা সুশিক্ষার গুণেই বিধবারা উৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে। ইতর-সুখলোভে কাতর হইয়া উন্মার্গগামিনী হওয়া অপেক্ষা ক্ষুদ্র সুখের মুখে পদাঘাত করিয়া জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিবার চেষ্টা যে শতগুণে লোভনীয়, একথা সুশিক্ষার গুণে বিধবাদের হৃদয়ঙ্গম

হইবে। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা অপেক্ষা যে ইন্দ্রিয়-দমন উৎকৃষ্ট, বাসনা-পরিতৃপ্তি অপেক্ষা যে বাসনা-উচ্ছেদই প্রকৃত সুখ-জনক, বিলাস-লোভ অপেক্ষা যে বিলাস-বর্জ্জনই প্রকৃত তৃপ্তিকর, একথা বিধবারা শিক্ষার গুণেই বুঝিবে। তুমি যে বিধবাদের সংবাদ আমাকে লিখিয়াছ, তাহারা শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিতা এবং জীবনের উন্নত আদর্শ সম্বন্ধে একান্তই অনভিজ্ঞা। তাই, আমি একই পাড়ায় আঠারটী বিধবা আছে শুনিয়া চমকিত হইয়াছি।

কিন্তু ইহারা তোমার পক্ষে এক সহজপ্রাপ্য কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে। এই আঠারটী বিধবাকে লইয়া তুমি তোমার জীবন-যজ্ঞের বেদী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিতে পার। ইহারা ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝে না কিছুই জানে না। তুমি ইহাদিগকে সেই সুপবিত্র জ্ঞান বিতরণ কর। কাঁচা কলা আর আতপ চাউল খাইলেই যে বৈধব্য-ব্রত রক্ষা করা হয় না, এই ব্রতের প্রকৃত তত্ত্ব যে আরও গভীর, একথা ইহাদের মধ্যে প্রচার কর। বিধবাকে যে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে ভোগবুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া নিয়ত ভগবৎ-সেবা-পরায়ণা হইয়া চলিতে হইবে, বিধবার অনুষ্ঠিত বাহিরের সদাচারগুলির মূল যে মনের মধ্যে, মনে মনে যে নিষ্ঠাবতী,—সেই যে প্রকৃত বৈধব্য-ধর্ম্ম পালন করিতেছে, তাহা ইহাদিগকে বুঝাও। লোকদেখান বৈধব্যের আচার মাত্র প্রতিপালন করিলেই যে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য হয় না, পরন্তু মনকেও কামনা-পাশ-মুক্ত এবং সুখ-মোহ-বর্জ্জিত রাখিতে হইবে, এই তত্ত্ব ইহাদের নিকটে পরিবেশন কর। যে সকল বালবিধবা পুনর্ব্বিবাহ করিয়া সংসারী হইতেছে, তাহাদের জীবনও যে বৈধব্যাচার-পরায়ণ ভণ্ড গুপ্ত-পাপিনীর কলুষিত জীবন অপেক্ষা পুণ্যময়, একথা আজ প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে গাঁথিয়া দাও। নারীর চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া জগতের হিত-সাধনে বা স্বকীয় আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সমগ্র জীবন-ব্যাপী আত্মোৎসর্গ করিবার সুযোগ বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে

নাই। বৈধব্য সেই সুযোগ। সংসারীর হীন বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া প্রাণের আশা মিটাইয়া পরোপকার এবং ভগবৎ-সাধনা করিবার পক্ষে বৈধব্য এক মাহেন্দ্র সুযোগ। স্বেচ্ছায় কেহ বৈধব্য কামনা করুক, ইহা প্রার্থনীয় নহে ; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় যাহারা বৈধব্য-ব্রত পালনের সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা এই সুযোগকে যথাযোগ্য-ভাবে গ্রহণ করুক এবং দেহ, মন ও প্রাণ দিয়া আত্মোন্নতি-সাধনে যত্নবতী হউক, ইহা কে না প্রার্থনা করিবে ? উচ্চচিন্তাসমূহ তুমি এই সকল বিধবাদের মনের মধ্যে গুঁজিয়া দাও,–নানা ইতিহাস, গল্প, উপাখ্যান, রূপক, তুলনা ও প্রসঙ্গের মধ্য দিয়া ইহাদিগকে উচ্চভাবের ভাবুক করিয়া তোল। ভাবহীন বৈরাগ্যের কোনও মূল্য নাই। ভাবহীন সদাচারের কোনও বাস্তব সুফল নাই। নিরামিষ, একাহার, বিশেষ বিশেষ দিবসে উপবাস প্রভৃতি যে সকল সদাচারের অনুষ্ঠান ইহারা করিতেছে, তাহার সঙ্গে কোনও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার ত' যোগ নাই, ইহাদিগকে বুঝাইয়া দাও, কেন ইহারা কি করে। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে, ইহাদের কলহ-পরায়ণতা কমিতেছে, সাংসারিক স্বার্থপরতা হ্রাস পাইতেছে এবং যাহাদের আচরণে চঞ্চলতা সূচিত হইতেছিল, তাহাদের চঞ্চলতা এবং চিত্তের বিক্ষিপ্ত ভাব ক্রমশঃ প্রশমিত হইতেছে।

কিন্তু তোমাকে বলিয়া রাখি মা, তোমাকেও এজন্য সাধনশীলা হইতে হইবে, সদ্গুরুর কৃপায় যে সাধন-পদ্ধতির তুমি অধিকারিণী হইয়াছ, সমগ্র দেহ-মন দিয়া সেই সাধন-সমুদ্রের তলদেশে যাইয়া পরমরত্ন ব্রহ্মধন আহরণে তোমাকে যত্নবতী হইতে হইবে। কেননা, অসাধকের কোনও কথা কেহ শোনে না, শুনিলেও সে কথা এক কাণ দিয়া প্রবেশ করিয়া তখন তখনই অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। যে বিধবাকুল আজ মানসিক দৈন্যের গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, যাহারা আজ সমাজের জঞ্জাল এবং সংসারের আপদ, যাহাদের অন্নবস্ত্র

আত্মীয় স্বজনেরা যোগায় শুধু চক্ষুলজ্জায় ঠেকিয়া, সেই অধঃপতিত বিধবাকুলের জীবনের নৈতিক দুর্গতি দূর করা যদি তোমার প্রার্থনীয় হইয়া থাকে, তবে তোমার জীবনটিকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মত করিতে হইবে। বিধবাদের কর্ম্মহীন কলহ-মুখর জীবনকে পরোপকারে লাগাইতে যদি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাক, তবে তোমাকেই সর্ব্বাগ্রে সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। এই কথা মনে রাখিয়া গভীর প্রযত্নে সাধন-নিমগ্না হও। যে জীবনে ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইল না, সেই জীবন বৃথা। যে জীবন অনন্তকোটি সন্তান-সন্ততির সেবার জন্য অর্পিত হইল না, সে জীবন মিথ্যা।

* * * *

সাধন সম্বন্ধে সর্ব্বজনীন ভাবে কোনও উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে। কেননা, কৃষকেরা ক্ষেত্র বুঝিয়া বীজ বপন করেন, বীজ বুঝিয়া জমির পরিচর্য্যা করেন এবং আকাশের অবস্থা বুঝিয়া ফসল চয়ন করেন। ধর্ম্ম-সাধনা ব্যক্তিগত ব্যাপার,—দল বাঁধিয়া ধর্ম্ম হয় না। তোমার প্রাণে এমন অনেক অপূর্ণতা রহিয়াছে, যাহা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কাহারও নাই। সেই সকল অপূর্ণতাকে ভগবৎ-পাদপদ্মের স্পর্শ দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য যে ব্যাকুলতা তাহারই নাম ধর্ম্ম-বোধ। আর, এই ব্যাকুলতাকে সার্থক করিবার জন্য যে সকল কর্ম্ম, চেষ্টা ও ভাবের অনুশীলন আবশ্যক, তাহা করার নাম ধর্ম্ম-সাধন। এক এক জনের অপূর্ণতা এক এক ভাবে দূর হয়,—এই জন্যই এক এক জনের ধর্ম্ম-সাধনা এক এক প্রকার। কাহার সাধন কিরূপ হইবে, তাহা সদ্‌গুরু নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং অনেক স্থলে সাধিকা নিজেও নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে পারেন। এই জন্যই সাধন-সম্বন্ধে কোনও গূঢ় বিষয় আজ আলোচনা করিব না। কিন্তু যাহা তোমাদের প্রত্যেকের কাজে লাগিতে পারে, এমন কতকগুলি ইঙ্গিত মাত্র করিব।

ভগবানের নামের সহিত ভগবানের নিত্য-সম্বন্ধ। নামের যে সাধনা করে, সে ভগবানেরই সেবা করে। একাগ্রচিত্তে ডাকিতে পারিলে নামের বলে ভগবান ভক্তের দাস হন। ডাকার মত ডাকিতে জানিলে এক ডাকেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন এবং ভক্তের সকল ভার, সকল দায় স্বয়ং বহন করেন। নামের যোগেই ভগবানের সহিত নিত্য-যোগ স্থাপিত হয় এবং নামের সুমধুর ধ্বনির মধ্য দিয়াই তাঁহার সুকোমল বংশী-নাদ ফুকারিয়া উঠে।

কোন্ নাম ধরিয়া ডাকিবে, তাহা তোমার ব্যক্তিগত রুচি, কুল-সংক্রামিত সংস্কার, সৎশিক্ষা-জনিত সামর্থ্য এবং আবাল্য-বর্দ্ধিত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যে নাম ধরিয়াই ডাক না কেন, তিনি সব নামেই রাজী। "কালী" বলিয়া ডাকিলে তিনি প্রীত হইবেন, "কৃষ্ণ" বলিলে কাণে শুনিবেন না, এমত নহে। "ব্রহ্ম" বলিয়া ডাকিলেই তিনি তুষ্ট হইবেন, "আল্লা" বলিলে রাগ করিবেন, এমন নহে। কোন্ নামে ডাকিবে, তাহা হৃদয়ের গতি দেখিয়া বুঝিয়া লইও। কিন্তু যে নামটী নির্দ্ধারিত করিবে, দিবারাত্রি সেই একটী নামেই নিমগ্না হইয়া থাকিবে। দশ বার দশ নামে ভগবান্‌কে ডাকিবার অপেক্ষা পাঁচ বার এক নামে ডাকিলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের দিকে অধিকতর অগ্রসর হওয়া যায়। যে নামটী দিয়া সাধন করিবে, সেই নামটী সর্ব্বপ্রযত্নে অপরের নিকটে গোপন রাখিবে।

নামজপ কালে লক্ষ্য এবং মন ভ্রূমধ্যে রাখিবে এবং প্রতি বার নাম উচ্চারণ করিবার সময়ে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, নাম সেই পরব্রহ্মেরই নাম, যিনি আদ্যাশক্তি স্বরূপ, যিনি পরম আনন্দের উৎস, যিনি সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ এবং যিনি পরমপ্রেমময় অদ্বিতীয় অখণ্ড-চৈতন্য। শুধু নাম জপিয়া গেলেই হয় না মা, প্রতিবার

নাম-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এই কথা মনে রাখিতে হয় যে, নামের মধ্য দিয়াই পরমগুরু পরমেশ্বর আত্মপ্রকাশ করিবেন। এমন সুদৃঢ় বিশ্বাস চাহি, যেন নাম উচ্চারণ-কালে তিনি সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। *** অত্র কুশল। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল-সংবাদে সুখী করিও। ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

জয় গুরু শ্রীগুরু

কলিকাতা

৯ই আশ্বিন, ১৩৩৪

নিত্যাশীর্ভাজিনীষু ঃ-

স্নেহের মা, *** বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহের প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা অগঠিত চরিত্র এবং অজ্ঞানীর পক্ষে। যাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে এবং ভালমন্দ শুভাশুভের জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, তেমন পুণ্যময়ী বিধবার সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবাহের কথা চিন্তা করাও মহাপাপ। পবিত্রতার আধারস্বরূপা এই সকল নমস্যা মহিলারাই জাতির মনুষ্যত্বকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

শাস্ত্রে পুরুষদেরও গার্হস্থ্য-জীবন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সে ব্যবস্থা আজ কে মানিতেছে? পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলেই সংসার ছাড়িয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় সংযমের জীবন যাপন করিবার বিধিও শাস্ত্রে আছে, কিন্তু শাস্ত্রের সেই কথা আজ কে শুনিতেছে? সকলেই শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিতেছে, সবাই আজ মতলবী-বিধানে চলিতেছে এবং নিজেদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সমর্থন করিবার মত শ্লোক শাস্ত্র হইতে খুঁজিয়া পাওয়া

নাম-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এই কথা মনে রাখিতে হয় যে, নামের মধ্য দিয়াই পরমগুরু পরমেশ্বর আত্মপ্রকাশ করিবেন। এমন সুদৃঢ় বিশ্বাস চাহি, যেন নাম উচ্চারণ-কালে তিনি সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। *** অত্র কুশল। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল-সংবাদে সুখী করিও। ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

জয় গুরু শ্রীগুরু

কলিকাতা

৯ই আশ্বিন, ১৩৩৪

নিত্যাশীর্ব্বাজিনীষু :-

স্নেহের মা, *** বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহের প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা অগঠিত চরিত্র এবং অজ্ঞানীর পক্ষে। যাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে এবং ভালমন্দ শুভাশুভের জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, তেমন পুণ্যময়ী বিধবার সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবাহের কথা চিন্তা করাও মহাপাপ। পবিত্রতার আধারস্বরূপা এই সকল নমস্যা মহিলারাই জাতির মনুষ্যত্বকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

শাস্ত্রে পুরুষদেরও গার্হস্থ্য-জীবন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সে ব্যবস্থা আজ কে মানিতেছে? পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলেই সংসার ছাড়িয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় সংযমের জীবন যাপন করিবার বিধিও শাস্ত্রে আছে, কিন্তু শাস্ত্রের সেই কথা আজ কে শুনিতেছে? সকলেই শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিতেছে, সবাই আজ মতলবী-বিধানে চলিতেছে এবং নিজেদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সমর্থন করিবার মত শ্লোক শাস্ত্র হইতে খুঁজিয়া পাওয়া

যায় কি না, শুধু সেই উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের জীর্ণ পুঁথি ঘাটিতেছে। যিনি মদ্য-মাংস সেবন করিতে ভালবাসেন, তিনিও শাস্ত্রের পুঁথি হইতে শ্লোক বাহির করিয়া দেখান যে, তিনি লোভ-পরবশ হইয়া কদাচারে আসক্ত হইতেছেন না, পরন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের অলঙ্ঘনীয় বিধানেই একান্ত দায়ে ঠেকিয়া মদ্য-মাংসের মহোৎসব করিতেছেন। যাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মরিয়াছে, তিনিও শাস্ত্র হইতেই একটা অনুষ্টুপ-ছন্দের শ্লোক-বাহির করিয়া পুনরায় ধর্ম্মের দায়ে চতুর্থ পক্ষের একটী দুগ্ধ-পোষ্য বালিকা-স্ত্রী গ্রহণ করিতেছেন। লম্পট লাম্পট্য করিবে, সেও শাস্ত্রের দোহাই দিবে ; শয়তান ভ্রূণহত্যা করিবে, সেও শাস্ত্রের দোহাই দিবে। ডাকাত নরহত্যা করিবে, সেও শাস্ত্রের দোহাই দিবে ! যখন প্রাণপাত পরিশ্রমের পরেও অনাচারের সমর্থক শাস্ত্রীয় শ্লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, তখন কাশী-কাঞ্চী-দ্রাবিড়ের, ভট্টপল্লী-নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায়গণকে কুইনাইনের বড়ীর সহিত বাটিয়া নির্লজ্জতার জলে গুলিয়া সেবনের ব্যবস্থা হইবে। এইভাবে সমগ্র জাতিটাই আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছে। কাক যেমন চক্ষু বুজিয়া নিজের ডিমগুলিকে বাসায় রাখে, আর ভাবে যে, কেউ দেখিল না, ঠিক্ তেমনি দুনিয়ার যত চোর, ডাকাত, শঠ, লম্পট শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুকার্য্য করিয়া মনে মনে ভাবে যে, কেউ আমার চালাকী বুঝিল না।

কিন্তু বিধবারা ইহা করেন নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর নারী-জাতি শাস্ত্রের সংযম-সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধগুলিকে প্রাণপণ যত্নে পালন করিয়া আসিয়াছে। শত দুঃখ, শত কষ্ট এবং শত লাঞ্ছনার মধ্যেও বিধবারা বড় সহজে কেহ তাহাদের সদাচার ও নিষ্ঠা বর্জ্জন করিতে চাহে নাই। কু-কাজ করিয়া তাহারা কখনও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মন্দটাকে ভাল বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা পায় নাই। বিধবাদের মধ্যে যাহারা পথভ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা কখনও এমন কথা বলে নাই যে, শাস্ত্রে পথভ্রান্ত হইবার বিধি আছে এবং এই জন্যই তাহারা ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য পথভ্রান্ত হইয়াছে।

অপিচ একজন বিধবা যদি কখনও পথভ্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে শত শত বিধবা নিজেদের জীবনের অপূর্ব্ব পবিত্রতা দ্বারা তাহার কু-ফল হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়াছে। পুণ্যচরিতা বিধবারা এই ভাবে সমাজের সকল মঙ্গলকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। সমাজের সর্ব্বত্র যখন কামুকতার প্রবল বন্যা খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, তখন এই সকল পুণ্যশ্লোক বিধবারাই ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। হিন্দুনারী যদি বৈধব্যের পবিত্র ব্রতকে অস্বীকার করিত তাহা হইলে পুরুষদের জীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে আকুমার ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের যে দীপ্তি দেখিতে পাই, খুব সম্ভবতঃ তাহা আরও বিরল হইত। ইতিহাসে স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই বটে, তবে ইহা অতি সত্য কথা যে, পুরুষদের মধ্যে যে সকল মহাত্মা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশেরই সদাচার সম্বন্ধীয় সুশিক্ষা পবিত্রচরিতা ধর্ম্মশীলা বিধবাদের দৃষ্টান্ত হইতে প্রাপ্ত। পুরুষেরা যখন বহুবিবাহের মোহে অন্ধ, সধবারা যখন কাম-যজ্ঞে নিজেদিগকে আহুতি দিবার জন্য ব্যস্ত, তখন এই সকল বিধবারাই স্বকীয় জীবনের সংযমের সুদৃষ্টান্ত দ্বারা এই সকল মহাপুরুষদের ভাবের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন, বিধবাদের জীবন হইতেই তাঁহারা ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যের উৎসাহ ও মনোবল সংগ্রহ করিয়াছেন। অথচ বিধবারা নিজেরাও একথা জানেন না।

একটি যুবক যখন চিরকুমারের পবিত্র জীবন-যাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন তাঁহার আত্মীয়-বান্ধবেরা কত করিয়া বুঝাইয়াছেন,—"চিরকাল কেহ সংযমী হইয়া থাকিতে পারে না, বৃথা চেষ্টা করিও না, বাড়াবাড়ি করিতে গেলে পদস্খলন হইবে।" তখন তিনি তাঁহার বিধবা মাসী, পিসী, মা, খুড়ী, ভ্রাতৃবধু, বড়দিদি, ছোট বোন প্রভৃতির পানে তাকাইয়া উত্তর দিয়াছেন,—"ইহারা অশিক্ষিতা এবং স্ত্রীলোক হইয়াও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে পারিতেছেন, আর আমি

সুশিক্ষিত এবং পুরুষ হইয়াও পারিব না ?”

বিধবা-জীবনের দৃষ্টান্তের এই মূল্যকে আমি বুঝি। তাই, আমি বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে তেমন উৎসাহী নহি। কিন্তু বাধ্যকর ব্রহ্মচর্য্য ত' ঠিক্ ঠিক্ ব্রহ্মচর্য্য নহে ! জোর করিয়া সদাচার পালন করাইলে ত' তাহাকে ঠিক্ ঠিক্ সদাচার বলা চলে না ! যে ধর্ম্মচর্য্যার সহিত তোমার স্বাধীন ইচ্ছার যোগ নাই, তাহাকে ত' ঠিক্ ঠিক্ ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করা যায় না ! স্বামীর মৃত্যু হইল, আর স্ত্রীটী একেবারে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী হইয়া গেলেন, ইহা ত' কখনও সম্ভব নহে ! “ব্রহ্মচর্য্য” কথাটা বলিতে সহজ, ইহা রক্ষা করা কঠিন। দেহ যদি ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ ত্যাগ করে, তাহা হইলেই যে পূর্ণ-ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হয়, তাহা নহে,—মনকেও ভোগ-বিমুখ করিতে হইবে, মনের মধ্যেও ভোগলিপ্সা থাকিতে পারিবে না। তবেই হইল অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য। অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য কেহ একদিনের চেষ্টায় লাভ করিতে পারে না, ক্রমশঃ চেষ্টার দ্বারা ধীরে ধীরে ইহা লাভ করিতে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরমুহূর্ত্ত হইতেই দৈহিক ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু মনকে শাসন করা ত' সহজ নহে। যে দেহ সর্ব্বপ্রকার অপবিত্রতা ও দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত রহিয়াছে, সেই দেহের ভিতরে থাকিয়াই হয়ত মন শতবার শত পাপে ও অপরাধে আসক্ত হইয়া বারবার কলুষিত হইতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে মনকে শাসনে রাখা জ্ঞানবল ও কঠিন সাধন-শক্তি দ্বারাই সম্ভব। স্বামি-বিয়োগের পর হইতে এই জ্ঞানবল ও সাধন-শক্তি লাভ করিবার জন্য নারী ব্রতচারিণী হইবেন, জ্ঞানের চর্চ্চা এবং সাধন ভজন করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য চেষ্টাশীলা থাকিবেন। যিনি কায়মনোবাক্যে এইভাবে আত্মার উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টিতা থাকিবেন এবং দেহের আসক্তি ও মনের বিলাস-লোলুপতাকে দূর করিতে সমর্থা হইবেন, চির-বৈধব্য তাহারই জন্য। চির-বৈধব্য একটা দুঃখ নহে, ইহা বিধবাজীবনের একটা গৌরব। নারীর পক্ষে চির-কৌমার্য্য আর চির-বৈধব্য

প্রায় সমান অবস্থা। এই গৌরব কি সকলেই লাভ করিতে পারে? কৌস্তুভ মণি কি সকলেই গলায় পরিতে পারে? জাম্ববান্‌কে প্রবল যুদ্ধে পরাস্ত করিবার পরেই শ্রীকৃষ্ণ কৌস্তুভ মণি লাভ করিয়াছিলেন। স্বামি-হীনা নারীও তেমন ইন্দ্রিয়-লালসারূপ প্রচণ্ড শত্রুকে পরাস্ত করিয়া চির-বৈধব্যরূপ পরম গৌরবকে লাভ করিবেন। অত্যধিক মূল্য না দিতে পারিলে কখনও জগতের শ্রেষ্ঠ জিনিষগুলি লাভ করা যায় না। চির-বৈধব্য এইরূপ একটী শ্রেষ্ঠ জিনিষ। যিনি ইহার উপযুক্ত নহেন, তিনি ইহা লাভ করিবার অধিকারিণী নহেন, যিনি যে জিনিষ রক্ষা করিবার উপযুক্ত শক্তিশালিনী নহেন, তাঁহার ঘাড়ে জোর করিয়া সেই জিনিষ চাপাইয়া দিলেই ত' আর হইল না! বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানহীনা এবং সাধনহীনা বিধবাদের উপরে জোর করিয়া চির-ব্রহ্মচর্য্য চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার ফল কখনই ভাল হইতে পারে না। ইহারা যাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারে, তাহার জন্য আগে ইহাদিগকে জ্ঞান দিতে হইবে। ইহারা যাহাতে গৃহীত ব্রহ্মচর্য্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহার জন্য ইহাদিগকে "সাধনা" দিতে হইবে। জ্ঞানের এবং সাধনের বলেই ব্রহ্মচর্য্য ইহাদের রুচিকর ও প্রীতিপদ হইবে। নহিলে, অজ্ঞান বালিকার স্কন্ধের উপরে সদাচারের জোয়াল জোর করিয়া বাঁধিয়া দিলেই কি ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা বাড়িবে?

এই জন্যই আমি বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধবাদীও নহি। স্বামীর মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই স্ত্রীকে যে তাহার যাবতীয় বিলাস-ব্যসন কাকবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিতে হয়, এই সামাজিক প্রথাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি এবং সমাজের উন্নতির দিক্ দিয়া বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়াও মনে করি। কারণ, এই সামাজিক প্রথাটা প্রত্যেক বিধবাকে পবিত্র জীবন-যাপন করিবার একটা সুযোগ দান করে। যাঁহারা চিরকুমারী থাকিয়া সমাজ-সেবা ও সাধন ভজনের সদিচ্ছা বাল্য অবধি মনে মনে

পোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু পিতামাতার মানসিক দুর্ব্বলতা হেতু বাধ্য হইয়াই বিবাহিতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই প্রথার কৃপায় চিরকুমারী-সুলভ পবিত্রতার অনুশীলন করিবার অবসর পান। যাঁহারা সধবা-জীবনের মধ্যে অসংযমের একান্ত প্রশ্রয় দেখিয়া শান্তি ও সংযমের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভের নির্ব্বিঘ্ন পন্থা পান। এই হিসাবে এই সামাজিক প্রথাটীর খুবই মূল্য আছে। কিন্তু মানুষ একটা জীবন্ত পদার্থ, তাহার উপরে চিরকাল কোনও "প্রথার" রাজত্ব চলিতে পারে না। এই প্রথাটীর সুযোগ লইয়া বিধবা-নারী তাহার জীবনকে সুগঠিত করুক। এই প্রথার সুযোগ লইয়া সে তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশ সাধন করুক তাহার স্বাধীন বুদ্ধির স্ফুরণের পরে তাহাকে নিজ প্রাণের টান বুঝিয়া চলিতে হইবে। সে যদি স্বেচ্ছায় কোনও প্রথাকে মানিয়া চলে, মানুক,—না মানে ক্ষতি নাই।

আমার ত' মা সুদৃঢ় ধারণা এই যে, **পতিবিয়োগের পর যদি জীবনগঠনের সুযোগ আমরা প্রত্যেক বিধবাকে দিতে পারি, তাহা হইলে পুনর্ব্বিবাহের প্রশ্নই আর উঠিবে না**। এমন নির্ব্বোধ এ জগতে অল্পই আছে, যাহারা জ্ঞান-লাভের পরেও অজ্ঞানীর মত কাজ করে। বিধবাদের মনের মন্দিরে যখন জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে, তখন তাহারা নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইবে, নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের পরিমাণ বুঝিতে এবং অনায়াসে নীচ বৃত্তিনিচয়কে দমন করিয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত রহিতে পারিবে। তখনই ব্রহ্মচর্য্যের যথার্থ গৌরব আসিবে। বলপূর্ব্বক পালন করান যে বৈধব্য, উহাতে গৌরব নাই,—উহা ম্লান, হীনশ্রী ও দূষিত। কিন্তু জ্ঞানলাভের পরে প্রত্যেক নারী নিজের স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃ যে বৈধব্যধর্ম্ম পালন করিবে, তাহা সর্ব্বপ্রকারে দোষমুক্ত, সর্ব্ববিধ ত্রুটিহীন, সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল এবং নিষ্কলঙ্ক হইবে। মা, অতীত কাল হইতেই তোমরা তোমাদের বৈধব্যের পবিত্রতা দিয়া

হিন্দুর জাতীয় সভ্যতাকে উজ্জ্বল ও সুশোভিত করিয়া রাখিতেছ এবং ভবিষ্যতেও তাহা করিবে, কিন্তু এ বৈধব্য লোকনিন্দার ভয়ে প্রতিপালিত অক্ষমের বৈধব্য নয় মা–এ বৈধব্য স্বেচ্ছায় গৃহীত, স্বেচ্ছায় পালিত, স্বেচ্ছায় রক্ষিত এবং জ্ঞানের দ্বারা পরিপোষিত।

মা, তুমি বোধ হয় আমার নিরপেক্ষ মতামত স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিতেছ। আমি কোনও নির্দ্দিষ্ট আন্দোলনের প্রচারক নহি, আমি মনুষ্যত্বের প্রচারক, মনুষ্যত্বের পূজক। যাহা করিলে এক দিক্ দিয়া সমাজের কল্যাণ হয়, তাহাই আমার কার্য্য নহে ; যাহা করিলে সকল দিক দিয়া সমাজের কল্যাণ হয়, তাহাই আমার কার্য্য। সমাজের ক্ষুদ্র একটুখানি সংস্কার করিয়াই আমার তৃপ্তি হইবে না, আমি চাই আমূল সংস্কার। তাই, আমি কোনও মতবিশেষের প্রতি পক্ষপাতগ্রস্ত নহি। যদি আমার কোনও কথা বুঝিতে না পার, তবে পত্রগুলি বারবার পড়িও এবং সাধন-ভজনের দ্বারা মনকে শান্ত করিবার পরে নিজের মনকেও নিজে প্রশ্ন করিও। পৃথিবীর সকল সত্য কখনও একখানা পত্রের মধ্যে, একখানা পুস্তকের মধ্যে বা একটা মানুষের জীবনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সত্য রহিয়াছে,–সেই সত্যের খনি তোমার নিজের বুকটার ভিতরেও আছে। শান্ত মন লইয়া সেইখানে অনুসন্ধান করিও,–দেখিও, বিশ্বসত্যের সহিত তুমি তোমার যোগ অনুভব করিতে পারিবে। আমার বিশ্বাস, সকল বিধবারই ব্রহ্মচর্য্য যখন জ্ঞান-সহকৃত হইবে, জ্ঞানের বলে বলীয়ান্ হইয়া যেই দিন প্রত্যেক পতিহীনা নারী চিরবৈধব্যকে স্বেচ্ছায় বাহু বেড়িয়া আলিঙ্গন করিবে, সেইদিন বিধবারা যাহা করিবেন, তাহা ইতিহাসে অপ্রত্যাশিত। কারাকক্ষে সেইদিন মুক্তির বাণী পৌঁছিবে, অন্ধ-গুহায় সেইদিন সূর্য্যোদয় হইবে, মরুভূমিতে সেইদিন লতা-মঞ্জরী অঙ্কুরিত হইবে, ঝিনুক দিয়া সাগর সেঁচিয়া সেদিন মুঠায় মুঠায় মুক্তা কুড়ান যাইবে। সেইদিন ব্রহ্মচারিণী বিধবারা ভারতবর্ষের

এক অচিন্তিত মহাশক্তিতে পরিণত হইবেন। ইহাদের নিষ্পাপ সংস্পর্শে সেইদিন আত্মবিস্মৃতা নারী-জাতি নিজ মহিমাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থা হইবেন এবং যাহা অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত ও পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহাই পুরুষ জাতির লক্ষ-যুগ-সঞ্চিত মিথ্যা ভ্রান্তিকে দূরীভূত করিবে।

ভবিষ্যতের বিধবারা যাহা করিবেন, তাহার জন্য আমি আজ মা তোমাদেরই পবিত্র জীবনের আমৃত্যু উৎসর্গ ভিক্ষা করিতেছি। ইতি—

তোমার পাগলা ছেলে

স্বরূপানন্দ

অষ্টম পত্র

ওঁ তৎসৎ

কলিকাতা

২১শে আশ্বিন, ১৩৩৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

মা, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ব্রহ্মচারীদিগকে যে সকল সদাচার পালন করিতে হয়, তোমাদের পক্ষেও তাহাই পালনীয় বলিয়া জানিও। সমগ্র দিবসের কার্য্য-বিভাগ কি ভাবে করিবে, তাহা কেহ দূর হইতে নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারে না। নিজের সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া কাল-নির্ণয় করিয়া লইও। নিম্নে আমি মোটামুটী রকম অপরাপর বিষয়ে বলিতেছি। এই পত্র তুমি তোমার প্রতিবেশিনী বিধবা বালিকাদিগকে দেখাইবে বলিয়া এমন অনেক কথাও লিখিলাম, যাহা ঠিক তোমার জন্যই নহে। তোমার নিজের প্রশ্নের উত্তরে যেটুকু বলা সঙ্গত, তাহার অতিরিক্ত যাহা বলিতেছি তাহা তোমার প্রতিবেশিনীদের জন্য বলিয়া বুঝিও।

সর্ব্বপ্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা বর্জ্জন করিয়া তোমাকে দৃঢ়চিত্ত এবং কঠোর-সঙ্কল্প হইতে হইবে। মন যে তোমার দাসানুদাস, সে যে তোমার শাসনে শান্ত হইতে বাধ্য, সে যে তোমার ভ্রূকুটীর অধীন হইয়া না

এক অচিন্তিত মহাশক্তিতে পরিণত হইবেন। ইহাদের নিষ্পাপ সংস্পর্শে সেইদিন আত্মবিস্মৃতা নারী-জাতি নিজ মহিমাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থা হইবেন এবং যাহা অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত ও পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহাই পুরুষ জাতির লক্ষ-যুগ-সঞ্চিত মিথ্যা ভ্রান্তিকে দূরীভূত করিবে।

ভবিষ্যতের বিধবারা যাহা করিবেন, তাহার জন্য আমি আজ মা তোমাদেরই পবিত্র জীবনের আমৃত্যু উৎসর্গ ভিক্ষা করিতেছি। ইতি—

তোমার পাগলা ছেলে

স্বরূপানন্দ

অষ্টম পত্র

ওঁ তৎসৎ

কলিকাতা

২১শে আশ্বিন, ১৩৩৪

কল্যাণীয়াসু ঃ-

মা, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ব্রহ্মচারীদিগকে যে সকল সদাচার পালন করিতে হয়, তোমাদের পক্ষেও তাহাই পালনীয় বলিয়া জানিও। সমগ্র দিবসের কার্য্য-বিভাগ কি ভাবে করিবে, তাহা কেহ দূর হইতে নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারে না। নিজের সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া কাল-নির্ণয় করিয়া লইও। নিম্নে আমি মোটামুটী রকম অপরাপর বিষয়ে বলিতেছি। এই পত্র তুমি তোমার প্রতিবেশিনী বিধবা বালিকাদিগকে দেখাইবে বলিয়া এমন অনেক কথাও লিখিলাম, যাহা ঠিক তোমার জন্যই নহে। তোমার নিজের প্রশ্নের উত্তরে যেটুকু বলা সঙ্গত, তাহার অতিরিক্ত যাহা বলিতেছি তাহা তোমার প্রতিবেশিনীদের জন্য বলিয়া বুঝিও।

সর্ব্বপ্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা বর্জ্জন করিয়া তোমাকে দৃঢ়চিত্ত এবং কঠোর-সঙ্কল্প হইতে হইবে। মন যে তোমার দাসানুদাস, সে যে তোমার শাসনে শান্ত হইতে বাধ্য, সে যে তোমার ভ্রূকুটীর অধীন হইয়া না

চলিয়া কিছুতেই পারে না,—এই বিশ্বাস রাখিও। **সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবে, মন যেন তোমার প্রভু না হইতে পারে, তুমিই যেন, সতত তাহার প্রভু থাকিতে পার,** সকল চাঞ্চল্য দমিত করিয়া তুমিই যেন তাহাকে ইচ্ছানুরূপ পথে পরিচালিত করিতে পার। তোমার ইচ্ছাই যেন মনের উপরে জয়যুক্ত হয়, মনের খেয়াল যেন কখনও তোমার সদিচ্ছাকে অভিভূত করিতে না পারে। প্রতিদিন সকালে সরল মেরুদণ্ডে স্থির আসনে বসিয়া প্রথমতঃ শরীরকে ও তৎপরে মনকে এই বলিয়া শাসন করিবে—"আমিই তোমার প্রভু, আমিই তোমার পরিচালক, আমিই তোমার নেতা। আমার আদেশকে অমান্য করিয়া চলিবার ক্ষমতা তোমার নাই। এমন সামর্থ্য তোমার কখনই হইতে পারে না যে, আমাকে কোনও অন্যায় চিন্তায় বা কলুষিত কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পার।"

মনকে সুসংযত রাখিবার জন্য নিয়ত ভগবানের নামে লাগিয়া থাকিবে। নামজপ করিতে তোমার ভাল লাগুক বা না লাগুক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। জপ করিতে করিতে আপনিই মনের সংযম আসিবে, আপনিই একাগ্রতা জন্মিবে। নাম-জপ করিতে করিতেই প্রাণ ভক্তি-রসে আর্দ্র হইবে, ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা আসিবে ; নাম-জপের ফলেই ভগবদ্বিশ্বাস জন্মিবে এবং সাধন করিবার সামর্থ্য জাগ্রত হইবে। মনে ভক্তি-বিশ্বাস আসিতেছে না বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, শত অভক্তি-অবিশ্বাসের মধ্যেও প্রাণপণ বলে নাম-জপ করিতে থাকিবে। নামের নিজস্ব একটা শক্তি আছে। সেই শক্তির মহিমা নাম করিতে করিতে আপনিই প্রকটিত হইবে। নাম করিতে কত সময় হয়ত বিরক্তি বোধ হইবে, কত সময় হয়ত অরুচি জন্মিবে, কিন্তু সেই সব গ্রাহ্য করিও না।

সর্ব্বদা চক্ষুকে, কর্ণকে এবং জিহ্বাকে সংযত রাখিবে। যে দৃশ্য দেখিলে মানসিক চঞ্চলতার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা, তাহা পরম লোভনীয় হইলেও ত্যাগ করিবে। বাসর ঘরে বরকন্যার আচরণ উঁকি মারিয়া

দেখিতে যাইও না বা আড়ি পাতিয়া দম্পতীর কথাবার্ত্তা শুনিও না। সংযমবিঘ্নকর বাক্যালাপে কাণ দিবে না ; বিবাহিত নরনারীদের দাম্পত্য জীবনের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীনা থাকিবে। জিহ্বাকে কখনও কোনও অব্রহ্মচর্য্যকর কথা উচ্চারণ করিতে দিবে না,—হয় জিহ্বা ভগবানের গুণগান করিয়া ধন্য হউক, নতুবা সে নিরব থাকুক।

পুরুষজাতিকে নিজ সন্তান বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিবে। যখনই কোনও পুরুষ দেখিবে, মনে মনে বলিবে, "ইনি আমার সন্তান, ভগবান্ আমার স্বামী" ইহা এরূপ অবিরল ভাবে অভ্যাস করিবে, যেন কোনও পুরুষের প্রতি সন্তান-ভাব ব্যতীত অন্য-ভাব কিছুতেই আসিতে না পারে। তুমি ভগবানের সহধর্ম্মিণী, ভগবানের সকল শক্তি তোমার মধ্যে আছে। ভগবান্ সত্যস্বরূপ, তুমিও সত্যস্বরূপিণী,—কোনও অসত্য তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবান্ মঙ্গলময়, তুমিও মঙ্গলময়ী,—কোনও অমঙ্গল তোমাকে কবলিত করিতে পারে না। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, তুমিও সর্ব্বশক্তিমতী,—কোনও অবস্থাই তোমার মানসিক দুর্ব্বলতা প্রলোভন-প্রবণতা সৃষ্টি করিতে পারে না। ভগবান্ তোজোময়, জ্যোতির্ম্ময়, তুমিও তেজস্বিনী ও জ্যোতিষ্মতী,—কোনও ভয়, শঙ্কা, ক্ষুদ্রতা, আত্ম-অবিশ্বাস, অশুদ্ধতা বা অপবিত্রতা তোমাতে থাকিতে পারে না। ভগবান্ সর্ব্বপাপমুক্ত নিষ্কলঙ্ক, তুমিও সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলুষ,—কোনও পাপ বা কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। ভগবান্ জগৎপিতা, তুমি জগন্মাতা, লীলাময়ের এই সুবিশাল রাজ্য তোমার সন্তান-সন্ততিতেই পূর্ণ, এ রাজ্যে তোমার পুত্র ব্যতীত অপর কোনও পুরুষ নাই। যখনই যে পুরুষ দেখিবে, তখনই তাহাকে মনে মনে সন্তান সম্বোধন করিবে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করিবে। তুমি জগতের সকলের মা,—বালকেরও মা, বৃদ্ধেরও মা, ধনীরও মা, দরিদ্রেরও মা। নিয়ত এই একটি তত্ত্বের অনুধ্যান করিতে করিতে তোমার মনে এমন এক সহজ

শক্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে যে, যখনই যাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, যখনই যাহার কথা তোমার মনে জাগিবে, তখনই সে তোমার প্রতি অকৃত্রিম মাতৃভাবে আত্মহারা হইয়া যাইবে। পুরুষ-জাতির প্রতি সন্তান-ভাবের অনুশীলন করিতে করিতে তোমার ভিতরে এমন এক অনির্ব্বচনীয় দিব্য সত্তার জাগরণ ঘটিবে যে, তোমার পদনখের পানেও চাহিবামাত্র দুরন্ত লম্পটের চিরকলুষিত হৃদয় মাতৃ-নামে, মাতৃ-গুণগানে মুখরিত হইয়া উঠিবে। যতই তুমি গভীরতর ভাবে পুরুষজাতির প্রতি সন্তানভাব আরোপ করিতে সমর্থা হইবে, তোমার সংশ্রবে সমাগত পুরুষগণের মধ্যে স্ত্রীজাতিতে-মাতৃভাব ততই সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা মিলে না, মিলিলেও প্রকৃত সাধু চিনিবার সহজ উপায় নাই। সুতরাং নিয়ত সাধু-জীবনী পাঠ করিবে। যে গ্রন্থে সৎপ্রসঙ্গ পাও, সেই গ্রন্থকে প্রাণেরও প্রাণ বলিয়া বিবেচনা করিবে। যে পুস্তকে ভগবানের কথা আছে, তাহাকে, বুকের পাঁজর করিয়া রাখিবে। প্রত্যেকটা সৎকথাকে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিবে এবং এক একটি কথার মর্ম্ম অবধারণ করিবার জন্য শান্ত মনে ধ্যান-নিবিষ্টা হইবে। তিন চারিখানা সদ্‌গ্রন্থ পঠিত হইয়া যাইবার পরে পুনরায় প্রথমখানা হইতে দ্বিতীয় বার পাঠ আরম্ভ করিবে। সব কয়খানা দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়া গেলে নূতন তিন চারিখানা বই পাঠ করিবে। তারপর আবার পূর্ব্বের ন্যায় এগুলিও এক একখানা করিয়া দ্বিতীয় বার পড়িবে। সদ্‌গ্রন্থকে রত্নের মত মূল্যবান্ মনে করিবে এবং নিকটবর্ত্তী পাঠাগার হইতে সংগ্রহ করিয়া পড়িবার চেষ্টা পাইবে। যে সকল গ্রন্থে দাম্পত্য জীবন বা নর-নারীর প্রণয় সম্বন্ধে আলোচনা আছে, তাহা বর্জ্জন করিবে। তোমার জীবন সন্ন্যাসীর ন্যায় সুপরিশুদ্ধ জীবন। তুমি যা' তা' পুস্তক পড়িতে পার না। বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ নাটক-নবেলই ইতর নরনারীর নিকৃষ্ট কাম-কথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং সেইগুলি বিষবৎ পরিত্যাগ করাই যুক্তি-সঙ্গত।

শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট তিনবার উপাসনা ব্যতীত রাত্রিতে শয়নের সময়েও

শয্যায় বসিয়া বসিয়া নাম জপ করিবে। জপ করিতে করিতে নিদ্রাকর্ষণ না হইলে শয়ন করিবে না এবং শয়ন করিয়াও সজোরে নাম-জপ চালাইতে থাকিবে। প্রথম প্রথম কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সেই কষ্টকে উপেক্ষা করিও। **নাম জপকালে মনে মনে চিন্তা করিও, ভগবান্ যেন তোমার সম্মুখে বসিয়া আছেন, তিনি যেন তোমার প্রত্যেকটি ডাক শুনিতে পাইতেছেন এবং প্রত্যেকটি ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুকের কাছে আসিতেছেন।**

যখনই কোনও কুচিন্তা আসিবে, তখনই গর্জ্জন করিয়া বলিও,—"কি ? আমি ভগবানের সহধর্ম্মিণী, ভগবানের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, আর আমার মনে এ পাপ আসিবে ! দূর হউক এই পাপ চিন্তা,—বজ্রের অনলে ইহা দগ্ধ হইয়া যাউক।" অথবা সেই কুচিন্তাকে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দিও। মনে মনে বলিও,—"হে ভগবান্, তুমিই আমার স্বামী, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। আমার সব কিছু তোমার, আমার পাপ চিন্তাও তোমার। আমার পাপ চিন্তাকে আমি তোমার পাদপদ্মে নিবেদন করিতেছি, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর এবং আমাকে মুক্তি দাও। আমি যখন তোমারই অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, তোমারই শ্রীচরণাশ্রয়-ভিখারিণী, তখন আমার পবিত্রতাকে রক্ষা করার দায়িত্বও যে প্রভো তোমারই।" পাপভাবে কোনও পুরুষ-মূর্ত্তি মনে আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভগবানের পায়ে সমর্পণ করিও। বলিও,—"আমি ভগবানের স্ত্রী, তুমি আমার সন্তান। তোমাকে আমি ঈশ্বরচরণে সমর্পণ করিতেছি, সেখানে গিয়া তুমি জীবনের পূর্ণতা আহরণ কর, অক্ষয় সিদ্ধি তোমার করায়ত্ত হউক। আমি তোমার মা, আমার নিকটে তোমার সন্তান-মূর্ত্তি ব্যতীত অপর সকল মূর্ত্তির বিলোপ সাধিত হউক, ভগবানের শ্রীপাদ-স্পর্শ পাইয়া তুমি পবিত্র হও এবং আমাকে তোমার মা বলিয়া জান।"

সর্ব্বদাই কোন না কোন সৎকার্য্যে লাগিয়া থাকিবে এবং **কাজ করিবার সময়ে মনে মনে ভগবানের নাম জপ করিবে।** অর্থ

বুঝিয়া বুঝিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিবে। একটি মুহূর্ত্তও আলস্যে ক্ষেপণ করিবে না। অলসতাই পাপের প্রসূতি, অলসতাই কুচিন্তার জননী। সর্ব্বপ্রযত্নে আলস্য জয় করিয়া চলিবে। একদিকে যেমন ঈশ্বরের নাম-রূপ অঙ্কুশের শাসনে মন-রূপ মত্ত মাতঙ্গকে বশীভূত রাখিবে, অপর দিকে তেমন নিয়ত-কর্ম্মশীলতা দ্বারা মনোমধ্যে কাম ও লালসার প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে। অন্যায়ের সহিত কখনও আপোষ করিবে না। ক্ষুদ্রতম দোষ এবং ত্রুটি হইতেও আত্মরক্ষা করিতে সতর্ক-ভাবে চেষ্টা করিবে।

সুশিক্ষিতা হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইবে। শিক্ষা সর্ব্বাবস্থায়ই প্রয়োজনীয় এবং সকল অবস্থাতেই শিক্ষা লাভ করা যায়,—শুধু-ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেই হয়। সুশিক্ষার গুণে বুদ্ধি-বৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইবে এবং বাসনার কুহক দমনের পটুত্ব বাড়িবে।

এইভাবে তুমি তোমার নিজ জীবন গঠন কর এবং প্রতিবেশিনীদের জীবন গঠন করাও। সর্ব্বশেষে এই একটি কথা মনে রাখিও মা,—ভগবানের পরম-পবিত্র মহানাম পাপের কুহক দূর করে, প্রলোভনের ছলনা নাশ করে, ভোগের মোহকে ধ্বংস করে। ভগবানের পরম-মঙ্গল মহানাম পাশব প্রবৃত্তি-সকলকে দমন করে, নিকৃষ্ট রুচির অবসান ঘটায়, ক্ষণিক সুখের লোভকে দূর করে। ভগবানের পরমাশ্রয় মহানাম আনন্দের উৎস খুলিয়া দেয়, নীরস হৃদয়কে সরস করে, প্রেমহীন প্রাণে প্রেমের বন্যা বহায়, প্রতপ্ত জীবনকে পরমরসে আর্দ্র করিয়া চিরানন্দ-নিকেতন-রূপে গড়িয়া তোলে। ভগবানের নাম লইয়া জীব ধন্য হয়, বিলাস-বাসনার বাহু-পাশ হইতে মুক্তি পায়, অনায়াসে জীর্ণ তরী বাহিয়া তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ অকুল সমুদ্র পার হইয়া যায়। জগতের সকল বন্ধুকে অবিশ্বাস করিয়া এই পরমবন্ধু করুণা-সিন্ধু নামের আশ্রয় নাও। ইতি—

নিত্যশুভার্থী

স্বরূপানন্দ

ব্রহ্মচারিণী বিধবার দৈনিক কর্ত্তব্য

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবে। এই সময়ে কোনও প্রকার সাংসারিক ভাবনা বা স্বার্থ-চিন্তাকে মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না। তোমার যিনি জীবন-মরণের একমাত্র সম্বল, যাঁহার চরণতলে আত্মসমর্পণ ব্যতীত তোমার আর কোনও কর্ত্তব্য নাই, সেই পরমানন্দধাম প্রিয়তম পরমেশ্বরেরই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা যে তোমাকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিল, বারংবার ইহা স্মরণ করিবে। তাঁহারই কাজ যে তোমাকে সমগ্র দিন ভরিয়া সম্পাদন করিতে হইবে, সমস্ত দিবসের ছোট-বড় সকল কাজে তাঁহাকেই যে মনন করিয়া চলিতে হইবে, এই বিষয়ে বারংবার সঙ্কল্প করিবে। প্রার্থনা করিবে,—"সমগ্র দিবসের মধ্যে আমি যেন নিমেষের জন্যও ভগবানকে না ভুলি, একবারের জন্যও আমি আত্মাভিমানে স্ফীত না হই।" মনে মনে বিশ্বাস পোষণ করিবে,—ভগবান্ তোমার আপনার-আপন হইয়া সর্ব্বদা তোমার সাথে সাথে বিরাজ করিতেছেন, তোমাকে অসত্য, অধর্ম্ম ও পাপ হইতে রক্ষা করিতেছেন।

শয্যাত্যাগ করিবার সময়েই তীব্র সঙ্কল্প করিবে,—

(ক) আজ আমি কোনও অধর্ম্ম-চিন্তা করিব না।

(খ) কটু কথা কহিয়া কাহাকেও মনঃপীড়া প্রদান করিব না।

(গ) ক্ষণিকের জন্যও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব না।

(ঘ) অন্ততঃ পক্ষে একটী স্ত্রীলোক বা বালিকাকেও ধর্ম্ম-বিষয়ে, সাধন-ভজন বিষয়ে বা পরোপকার-বিষয়ে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা পাইব।

তৎপরে মলমূত্রাদি ত্যাগ এবং দন্ত মার্জ্জন করিবে। পাইখানার বেগ হউক আর না হউক, প্রতিদিন একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাইখানাতে যাওয়া কর্ত্তব্য।

তৎপরে দশ-পনের মিনিট সময় ব্যায়াম করিবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্যায়াম করা বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী-সমাজে লোকনিন্দার ব্যাপার। কিন্তু অতীত যুগে ভারত-মহিলারা পুরুষদের ন্যায় অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিতেন,—ভারতবর্ষের সেই গৌরব-যুগে স্ত্রীলোকের পক্ষে শারীরিক শক্তির চর্চ্চা নিন্দাজনক বা লজ্জাকর ব্যাপার ছিল না। এখনও ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র-অঞ্চলে স্ত্রীলোকের মধ্যে ব্যায়ামের সমাদর আছে। পরন্তু বাঙ্গালী-সমাজ ব্যায়ামের উপকারিতা বোঝে না বলিয়াই ইহার নিন্দা করে। স্ত্রীলোকেরা লোক-লোচনের অজ্ঞাতসারে ব্যায়ামের অনুশীলন করিতে করিতে বল, স্বাস্থ্য ও তেজস্বিতায় বিমণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিলে কালক্রমে ইহার প্রতি দেশের লোকের মত আপনিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সুতরাং অপরের অজ্ঞাতসারে হইলেও ব্যায়াম অভ্যাস করা প্রত্যেক মহিলার একান্ত কর্ত্তব্য।

বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে সাধারণতঃ সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। তাহাদের পক্ষে অধিক সময় ব্যায়াম করিবার প্রয়োজন-নাই। কিন্তু কিছু কিছু করিয়া অভ্যাস করা আবশ্যক, যেন প্রয়োজন হইলে দৈহিক শক্তির যে কোনও প্রকার ব্যবহার করা যাইতে পারে। জীবনে এমন অনেক সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত আসে, যখন স্ত্রীলোককেও বাহুবল প্রয়োগ করিয়া নিজের মান-মর্য্যাদা ও সতীত্ব-সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হয়। সুতরাং দেহের বল ও মনের সাহস বৃদ্ধির জন্য প্রত্যহই নিয়মিত ভাবে অল্প অল্প করিয়া ব্যায়ামের অনুশীলন করা একান্তই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তোমাদের

পক্ষে কখনই অনাবৃত স্থানে প্রকাশ্যভাবে ব্যায়াম করা সঙ্গত নহে।

ব্যায়াম করিবার কালে মনে মনে তীব্রভাবে সঙ্কল্প করিবে,-

১। **"সামান্য পরিমাণ ব্যায়ামের দ্বারাই আমার দেহে অসামান্য শক্তির সঞ্চার হইতেছে।"**

২। **"ব্যায়াম-সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের মধ্যে অপরিসীম সাহস সঞ্জাত হইতেছে।"**

৩। **"আমার সতীত্ব-সম্ভ্রমের প্রতি অপমান-জনক ব্যবহার করিয়া কোনও অধার্ম্মিক ব্যক্তি কখনও ক্ষমা পাইবে না।"**

৪। **"এমন-কি একাকিনী থাকিয়াও আমি নিজের বাহুবলে সকল প্রকার বিপৎ-সঙ্কুল অবস্থাতে স্বকীয় সতীত্বের গৌরব বাঁচাইয়া রাখিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতেছি।"**

কিরূপ ব্যায়াম তোমাদের পক্ষে অভ্যাস করা বিধেয়, তাহা যার-তার নিকট হইতে শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে না।

তৎপরে স্নান করিবে এবং স্নানানন্তর উপাসনা করিবে। প্রতিদিন একই নির্দ্দিষ্ট আসনে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনা করিতে যত্ন পাইবে। উপাসনা-কালে ধ্যানজপ প্রভৃতি কিরূপ প্রণালীতে করিবে, তদ্‌বিষয়ে প্রত্যেক ব্রহ্মচারিণী নিজ নিজ গুরুদেবের উপদেশমত চলিবে। যাহারা গুরূপদেশ পাও নাই, তাহারা নিম্নলিখিত ভাবে উপাসনা করিতে পার।

মেরুদণ্ড সরল করিয়া স্থিরভাবে আসন করিয়া বসিয়া প্রথমতঃ ভক্তি-সহকারে একটি বা কয়েকটি স্তোত্র পাঠ করিবে এবং স্তোত্র পাঠের

ফলে মনে একটুকু প্রশান্ত ভাব আসিলেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রার্থনা করিতে থাকিবে,—

"হে ভগবন্, আমি অবলা বিধবাবালা, কেহ আমার নেতা নাই, তুমি আমার নেতা হও। কেহ আমার বান্ধব নাই, তুমি আমার বান্ধব হও। কেহ আমার ভরসা-দাতা নাই, তুমি আমার ভরসা-স্বরূপ হও। তুমি আমার প্রাণের বল হও, অন্তরের বিশ্বাস হও, হৃদয়ের সাহস হও, চিত্তের একাগ্রতা হও। তুমি আমাকে জগতের সকল প্রলোভন হইতে মুক্ত কর, আমাকে একমাত্র তোমারই কৃপা-ভিখারিণী করিয়া রাখ। তুমি আমাকে সত্যের পানে টানিয়া নাও, আমার মনের জমাট অন্ধকার দূর কর, আমাকে অখণ্ড পবিত্রতা দান কর। হে জগৎ-স্বামী ! তুমি আমার স্বামী হও। হে জগন্নাথ ! তুমি আমার নাথ হও। হে সর্ব্বশরণ্য ! তুমি আমাকে একান্তই শরণাপন্না জানিয়া অভয়-চরণে আশ্রয় দাও।

প্রার্থনা-কালে মনে করিতে থাকিবে যেন ভগবান্ তোমার সম্মুখে বসিয়া প্রার্থনার প্রত্যেকটি কথা শ্রবণ করিতেছেন এবং তাহা পূর্ণ করিতেছেন।

অতঃপর ভাবনা করিতে থাকিবে যেন তোমার সমগ্র দেহের যাবতীয় শক্তি-পুঞ্জ আসিয়া তোমার ললাটের নিম্নভাগে ভ্রূদ্বয়ে আসিয়া জমিয়াছে। তৎপর সেই স্থানে মন স্থির করিয়া ভগবানের কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট নাম (দীক্ষাপ্রাপ্তা হইয়া থাকিলে দীক্ষালব্ধ নাম) অবিরল ভাবে জপ করিতে থাকিবে। প্রতিদিন একই নাম নিষ্ঠা-সহকারে জপিবে, নিত্য নূতন নামের শরণাপন্না হইও না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ না করে,

ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই জপ পরিত্যাগ করিবে না।

প্রথম-সাধিকার পক্ষে সংখ্যা রাখিয়া নাম জপ করাই ভাল। অন্ততঃ পক্ষে এক শত আটবারের কম কিছুতেই জপ করিবে না। মালা দ্বারা সংখ্যা রাখিতে বড়ই সুবিধা। জপের পক্ষে রুদ্রাক্ষ বা তুলসীর মালাই প্রশস্ত। মালা সংগ্রহ না করিতে পারিলে হাতেই সংখ্যা রাখিবে। যাহারা সদ্‌গুরুর চরণ-প্রান্তে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম জপের কৌশল জানিয়াছ, তাহারা শ্বাসে প্রশ্বাসেই জপ করিবে,—মালায় বা করে জপ করিবার আবশ্যকতা তাহাদের নাই।

প্রাতে অথবা দিবসের যে-কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিছু সময় সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিবে। গীতা হইতেছে জগতের সমগ্র গ্রন্থরাজির মুকুটমণি। সুতরাং গীতা অবশ্যই পড়িবে। গুরু-পরম্পরায় যদি কোনও সদ্ভাবোদ্দীপক মহদ্‌গ্রন্থ পাইয়া থাক, যাহা তোমার সাধন-ধর্ম্মের একান্ত অনুকূল, তবে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য দিবে। যথা,—অখণ্ড-সংহিতা। সদ্‌গ্রন্থ পাঠের জন্য যদি অধিক সময় দিতে না পার, তাহা হইলে নির্দ্ধারিত ভাবে প্রত্যহ অন্ততঃ একটি পৃষ্ঠাও পড়িবে।

তৎপরে যাবতীয় সাংসারিক কর্ম্মে লিপ্ত হইবে। কিন্তু কাজ করিবার সময়েও নিয়ত স্মরণ রাখিবে যে, তোমার জীবন এবং সর্ব্বস্ব একমাত্র ভগবানেরই জন্য। সংসারের সেবা করিতেছ কর্ত্তব্য-বোধে, কিন্তু তুমি সংসারের দাসী নহ, তুমি ভগবানেরই দাসী। সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যেও ভগবানের পরম-মঙ্গল মহানাম জপ করিতে থাকিবে।

দ্বিপ্রহরে স্নানের পরেও পুনরায় উপাসনা করিবে।

আহার করিবার সময়ে কথাবার্ত্তা বলিবে না। খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ জ্ঞানে ভক্তিভরে আহার করিবে এবং প্রতি গ্রাসে

হয় শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিবে, নতুবা মনে মনে সঙ্কল্প করিবে,–"আমি জগতের কল্যাণকারিণী হইতেছি।" আহার-কালে মনকে যত পবিত্র রাখিতে পারিবে, আহার্য্য বস্তু দেহের প্রত্যেকটী অণুপরমাণুকে তত পবিত্র কর্ম্মের উপযোগী করিয়া গড়িতে থাকিবে। আহার-সময়ে হিংসা-বিদ্বেষ, কাম-ক্রোধ, কুচিন্তা-কুবুদ্ধি এবং যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক উত্তেজনা যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে। আহার্য্য গ্রহণ-কালে কেবল এই কথাটুকু মনে রাখিবে যে, অখণ্ড পবিত্রতার দিব্য জ্যোতি দিয়া জীবনটাকে মহিমা-দীপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই তোমার প্রতিদিন ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

দ্বিপ্রহরের কর্ত্তব্যাদি সম্পাদনের পরে নিয়মিতভাবে লেখাপড়ার চর্চ্চা করিবে। শিক্ষার গুণে সহায়-সম্বল-হীনা অনাথা অবলাও লক্ষ লক্ষ মানবকে কটাক্ষের ইঙ্গিতে পরিচালন করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। বলিতে কি, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে এইরূপ অলোক-সামান্য শক্তি-সম্পন্না মহিলা-কর্ম্মীদের দলে দলে আবির্ভাব ঘটিবে। কেননা, ভগবৎ-সাধনার সহিত শিক্ষা ও সাহস যুক্ত হইলে স্ত্রীলোকেরা না করিতে পারেন, এমন কোনও সুমহৎ কার্য্য নাই। সুতরাং শিক্ষালাভ-বিষয়ে বিশেষ ভাবেই উৎসাহিত হইবে।

শিক্ষালাভের সুবিধার জন্য সুশিক্ষিতা মহিলারই সাহায্য লাভের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। এইরূপ মহিলা না পাওয়া গেলে পুরুষদের সহায়তা লইতে পার, কিন্তু নিতান্ত বিশ্বাস-ভাজন ও সুদৃঢ়-চরিত্র-বল-সম্পন্ন একান্ত আত্মীয় ব্যতীত অপর কাহারও নিকটে শিক্ষার্থিনী হইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। স্ত্রীলোকের সম্পর্কে অধিকাংশ পুরুষই পঞ্চবটী-বনের সাধু-সজ্জাধারী ছদ্মবেশী রাবণের ন্যায় রক্ত-মাংস-লোলুপ রাক্ষস। সুতরাং শিক্ষালাভের জন্য **পুরুষদের সহিত কখনও মিশিতে**

হইলে নিম্নলিখিত নিয়মকয়টী যৎপরোনাস্তি কঠোরভাবে পালন করিবে।

১। কখনও অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা করিবে না। যেহেতু, বৃথা ঘনিষ্ঠতা অনেক সময় পবিত্র মনের ভিতরেও অপবিত্রতা জন্মায়।

২। শিক্ষা লাভার্থে যতটুকু প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত কথাবার্ত্তা বলিবে না। বাক্-সংযমের অভাব বা বাগ্‌বিলাস অনেক সময় অতর্কিত ভাবে নৈতিক জীবনের উপর বহু দুর্গতি ডাকিয়া আনে।

৩। শিক্ষাদাতার কোনও আচরণে, ব্যবহারে, বাক্যে বা ইঙ্গিতে তোমার নারী-মর্য্যাদার বিন্দুমাত্র হানির সম্ভাবনা দেখিলে বজ্রের মত দৃঢ় এবং ভয়ঙ্করী হইবে।

সন্ধ্যা-সমাগমে পুনরায় উপাসনা করিবে। ভাল ভাল সংস্কৃত, বাংলা বা হিন্দী স্তোত্র ও প্রার্থনা-সঙ্গীত কণ্ঠস্থ করিবে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় সুর-সহযোগে আবৃত্তি করিবে। রুচি থাকিলে পরলোকগত স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি এবং (সাকার ব্রহ্মোপাসনায় দীক্ষিতা হইয়া থাকিলে) ইষ্টমূর্ত্তি ধূপদীপের দ্বারা আরতি করিতে পার।

রাত্রিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিদ্রাবেশ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যায় বসিয়া নামজপ করিবে। এই সময় ব্যতীত অপর কোনও সময় শয্যায় বসিয়া জপ করিবে না,—তজ্জন্য পৃথক্ আসন রাখিবে। শয়নের কালে কোনও প্রকার সাংসারিক ভাবনা বা কু-চিন্তাকে মনের কোণেও প্রবেশ করিতে দিবে না। রাত্রিতে কখনও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে অবিরত ইষ্টনাম স্মরণ করিতে থাকিবে। সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে যে, ইষ্টনামই অভীষ্ট-সিদ্ধির একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য অবলম্বন।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্য-পালন সম্পর্কিত কতিপয় জিজ্ঞাসার উত্তর

প্রশ্নঃ-ব্রহ্মচর্য্য কি ?

উত্তর ঃ-ব্রহ্মে বিচরণ করা অর্থাৎ ভগবানের প্রেম-রসে ডুবিয়া যাওয়ারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। কিন্তু এইরূপ উচ্চ অবস্থা লাভ করার জন্য সম্যক্ ইন্দ্রিয়-সংযম ও চিত্ত-শুদ্ধি চাই। তাই, ইন্দ্রিয়-সংযম ও চিত্ত-শুদ্ধির সাধনা করার নামই ব্রহ্মচর্য্য।

প্রঃ- ব্রহ্মচারিণী কাহাকে বলে ?

উঃ- যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন অর্থাৎ ভোগ-প্রার্থী ইন্দ্রিয়-নিচয়কে সংযত করিয়া এবং চিত্তকে পবিত্র রাখিয়া আত্মোন্নতি-সাধনে অথবা পরহিত-তরে জীবন নিয়োজিত করেন, সেই পুণ্যময়ী মহিলাই ব্রহ্মচারিণী।

প্রঃ- প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর লক্ষণ কি ?

উঃ- প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া চলেন, কাম-ভাব বর্জ্জন করেন, দেহ ও মনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন, জিহ্বাকে কলুষিত কথা হইতে বিরত রাখেন, কর্ণকে অসৎ-প্রসঙ্গ হইতে দূরে রাখেন, অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং সর্ব্বদা আত্মগঠনে, জগৎ-কল্যাণে ও ভগবচ্চিন্তায় কালযাপন করেন।

প্রঃ- ইন্দ্রিয়-সংযম কাহাকে বলে ?

উঃ- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ (চর্ম্ম) এই পাঁচটী আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাগ্‌যন্ত্র, হস্ত, পদ, পায়ু এবং উপস্থ (জননেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাভির নিম্নস্থিত যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য নির্ণীত হয় এবং যাহার সাহায্যে সন্তান জন্মলাভ করে), এই পাঁচটীর নাম

কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের সহায়তায় মানুষ নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের সহায়তায় কর্ম্ম-সম্পাদন করে ; চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নেয়, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন গ্রহণ করে এবং ত্বক্ (বা চর্ম্ম) দ্বারা স্পর্শ লাভ করে ; আবার বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা কথা বলে, হস্তের দ্বারা ধরে, পদ দ্বারা গমন করে, পায়ু দ্বারা মলত্যাগ করে, উপস্থের দ্বারা মূত্রত্যাগ এবং অপরাপর কার্য্য করে। এইরূপে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। ইচ্ছা করিলে মানুষ এই সকল ইন্দ্রিয়কে সৎকার্য্যেও লাগাইতে পারে, আবার অসৎ কার্য্যেও নিয়োজিত করিতে পারে। ইন্দ্রিয়-সকলকে অসৎ-কার্য্যে নিয়োজিত করিবার নাম অসংযম এবং ইহাদিগকে অসৎ কার্য্য হইতে বিরত রাখার নাম সংযম।

প্রঃ– ইন্দ্রিয়-সংযমের সাধন কি ?

উঃ– ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রাণপণ যত্নে অসদ্‌বিষয় হইতে দূরে রাখার চেষ্টাই ইন্দ্রিয় সংযমের সাধন। চক্ষু যদি কুদৃশ্য দেখিতে চাহে, তবে তাহাকে সেই দিক হইতে টানিয়া আনিবে এবং ইন্দ্রিয়জয়ী সিদ্ধ মহাপুরুষগণের ও ভগবানের চিন্তন আরম্ভ করিবে। কর্ণ যদি কুকথা শুনিতে চায়, তবে তৎক্ষণাৎ এমন স্থানে চলিয়া যাইবে, যেখানে গেলে কুকথা কর্ণে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং সুমধুর ভগবৎ-সঙ্গীতে বা স্তোত্রপাঠে নিরত হইবে। দেহ যদি কোনও অপবিত্র বস্তুর বা নিষিদ্ধ ব্যক্তির স্পর্শ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুর বা ব্যক্তির সংস্পর্শ অবিলম্বে বর্জ্জন করিবে এবং মনে মনে বারংবার ভাবনা করিতে থাকিবে যে, তোমার এই দেহ ভগবানের পূজার মন্দির, এখানে অপবিত্রতার প্রবেশাধিকার নাই। জিহ্বা যদি কুকথা কহিতে চাহে তবে তৎক্ষণাৎ মৌনী

হইবে এবং জিহ্বাকে উল্‌টাইয়া তালুমূলে সংযুক্ত (খেচরী মুদ্রা) করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে থাকিবে। পদদ্বয় যদি কু-অভিসন্ধিতে বা অন্যায় উদ্দেশ্যে অথবা ভোগ-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া কিংবা মোহের আকর্ষণে অথবা বিনা প্রয়োজনে কোথাও যাইতে চাহে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আসন করিয়া বসিবে এবং সদ্‌গ্রন্থ পাঠ বা ভগবৎ সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবে। হস্তদ্বয় যদি কোনও কুকার্য্য করিতে বা কুকথা লিখিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানের গুণ-প্রশংসা পূর্ব্বক বারংবার ভক্তিরস-পূর্ণ স্তোত্র-পাঠ করিতে আরম্ভ করিবে। উপস্থ অর্থাৎ গুপ্তেন্দ্রিয় যদি নিষিদ্ধ বিষয়ের জন্য লালসা-চঞ্চল হয়, তাহা হইলে যোনি-মুদ্রা * করিয়া শরীরের অধোদেশে সমাগত মনঃশক্তিকে ভ্রূ-মধ্যে স্থাপিত করিয়া নামজপ করিতে থাকিবে।

প্রঃ— ইন্দ্রিয়-সংযমের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সম্বন্ধ কি ?

উঃ— ইন্দ্রিয়-সংযম না করিতে পারিলে কেহই ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিতে পারে না। কারণ, সকল ইন্দ্রিয়কে ভোগচর্চ্চা হইতে বিরত করিয়া ভগবানের নামরসে ও তাঁহার প্রেমামৃতে মজিয়া থাকারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। উপস্থের অর্থাৎ গুপ্তেন্দ্রিয়ের সংযমই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম কথা।

প্রঃ— শুধু উপস্থ-সংযম করিলেই কি ব্রহ্মচর্য্য হয় ?

উঃ— না, উপস্থের (গুপ্তেন্দ্রিয়ের) সংযম ব্যতীত আরও সর্ব্বপ্রকার

*** যোনি মুদ্রাঃ—** ধীরতার সহিত গুহ্যদ্বার দেহাভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়া অর্দ্ধ বা সিকি মিনিট কাল তদবস্থায় রাখিবে। কুঞ্চনমান গুহ্যতন্তুসমূহের স্পন্দনের ধ্বনির প্রতি মনঃ-সন্নিবেশ করিলে যে এক নাদ শ্রুত হইবে, তাহাকে প্রণব (ওঁ) রূপে কল্পনা করিবে এবং মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সেই ধ্বনি যেন ভ্রূমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে, চিন্তাবলে এইরূপ অনুভব করিতে চেষ্টা পাইবে। ওঙ্কার-ধ্বনি ভ্রূমধ্যে গিয়া পৌছিয়াছে অনুভব করিবার পরে গুহ্যদেশের আকুঞ্চন ছাড়িয়া দিতে হয়। বিশেষ বিবরণের জন্য "সংযম-সাধনা" দ্রষ্টব্য।

সংযমই আবশ্যক। একজন উপস্থের কোনও ব্যবহার মাত্রও করিল না কিন্তু কামভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাহারও সহিত একত্র অবস্থান করিল, কথা বলিল, রূপ দর্শন করিল, রূপ-চিন্তন করিল, স্পর্শ করিল, আলিঙ্গন করিল বা চুম্বন দিল,–ইহাতে ব্রহ্মচর্য্য সমূলে ধ্বংস হয়। উপস্থের ব্যবহার বন্ধ করিলেই ব্রহ্মচর্য্য হইয়া যায়, তাহা নহে, পরন্তু কামভাব অনুপ্রাণিত হইয়া সৎকথা বলিলেও, সৎগ্রন্থ পড়িলেও বা সৎসঙ্গ করিলেও ব্রহ্মচর্য্যের হানি ঘটিতে পারে। কামভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়া চাই, তবেই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য লাভ হইল। আবার, তোমার অন্তর হইতে সকল কামভাব দূরীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়া যে অনাসক্ত ভাবে কামের উত্তেজক কার্য্য করিতে তুমি অধিকারিণী, তাহাও নহে। কামহীন অন্তকরণ লইয়াও যদি কেহ এমন কার্য্য করে, এমন চিন্তা করে, এমন বাক্য বলে, যাহার ফলে কামোদ্রেক হইবে, তবে তাহাকেও ব্রহ্মচর্য্যের বিষম শত্রু বলিয়া জানিতে হইবে। অতীত জীবনের ইন্দ্রিয় সুখাস্বাদের কথা অথবা অপরের ইন্দ্রিয়সেবার বিষয় স্মরণ করিবে না। ইন্দ্রিয়-সুখকর বিষয় নিয়া আলোচনা বা রহস্যালাপ করিবে না। ইন্দ্রিয়-সুখের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে উদ্দীপিত হয়, এমন কোনও প্রকার ক্রীড়া বা হাস্যরসিকতা প্রভৃতি করিবে না। অপর কোনও নরনারী, জীবজন্তু, পশুপক্ষী বা কীট-পতঙ্গাদি যখন ইন্দ্রিয়সেবা করিতেছে, তখন তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। যাহার সহিত একাকী অবস্থানে, যাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিলে, যাহার সহিত গোপনীয় বিষয়ে আলোচনা করিলে কামোদ্রেকের সম্ভাবনা, তাহার সংস্পর্শ মাত্রেও যাইবে না। ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিবার কোনও ইচ্ছা বা সঙ্কল্প প্রাণে পোষণ করিবে না, অথবা এইরূপ অসৎ আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ভ্রমেও কোনও চেষ্টা-

চরিত্র করিবে না।–তবে গিয়া তুমি ব্রহ্মচারিণী হইলে। ব্রহ্মচর্য্যের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, দেহ-মনকে পবিত্র রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্‌কে আরাধনা করিতে হইবে।

প্রঃ– যদি কেহ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া ভগবানকে আরাধনা না করে ?

উঃ– তাহা হইলে সে সহজেই পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত হইতে স্খলিত হইয়া নরকে হাবুডুবু খাইবে। যিনি স্বয়ং পবিত্রতাস্বরূপ সেই পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইতে পারিলেই অটুট ব্রহ্মচর্য্য লাভ হইয়া থাকে। ভগবৎ-সাধনহীন নীতিজ্ঞান কাহাকেও প্রবল প্রলোভনে রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা কিছুতেই ভগবদারাধনা করিবে না, তাহারাও যদি অন্ততঃ নীতিজ্ঞান মানিয়া চলে, তবে তাহা মন্দের ভাল।

প্রঃ– ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন কি ?

উঃ– ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন অনন্ত। শ্রুতি বলেন,–"সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্"–অর্থাৎ 'ভগবানকে সত্য দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা এবং ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা সম্যগ্-রূপে এবং নিত্যকালের জন্য লাভ করা যায়'। বস্তুতঃ অব্রহ্মচারীর কখনও ব্রহ্মদর্শন ঘটে না। আর ব্রহ্মচর্য্যের ফলে বুদ্ধি ও মনের বল বাড়ে, স্মৃতি-শক্তি ও মেধা বর্দ্ধিত হয়, হিংসা-দ্বেষাদি দূর হয়, ক্রোধ প্রশমিতহয়, পরনিন্দায় প্রবৃত্তি কমে। মহাযোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন,–"ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ"–অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে "বীর্য্যলাভ" হইয়া থাকে। এখানে "বীর্য্য" বলিতে "অফুরন্ত কর্ম্ম-সামর্থ্য", "অসাধারণ মানসিক শক্তি", "সর্ব্বকর্ম্মে অপরাজেয় উৎসাহ", "লক্ষ্য লাভে অচিন্তিত অধ্যবসায়" এবং "ব্রহ্মতেজ" বুঝায়। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায় অফুরন্ত কর্ম্মসামর্থ্য

লাভ হয়, মনের অসাধারণ শক্তি-সমূহ বিকশিত হয়, সর্ব্বকর্ম্মে অপরাজেয় উৎসাহ অনুভব করা যায়, উদ্দেশ্য-সিদ্ধিকল্পে অসামান্য অধ্যবসায় জন্মে এবং দেহের মধ্য দিয়া আত্মার পরমাশ্চর্য্য শক্তি ও দিব্য সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে। যিনি ব্রহ্মচর্য্যশালী, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ নিরোধ করিতে পারে না, তাঁহার সঙ্কল্পকে কেহ ভাঙ্গিতে পারে না, তাঁহার আদেশকে কেহ অমান্য করিতে পারে না, তাঁহার উপদেশকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, তাঁহার বাক্যকে কেহ নিষ্ফল করিতে পারে না, তাঁহার চেষ্টাকে কেহ ব্যর্থ করিতে পারে না।

প্রঃ– আতপ চাউল ও কাঁচা কলার সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সম্পর্ক কি ?

উঃ– বিধবাদিগের জন্য হবিষ্যান্ন গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। 'হবিষ্যান্ন' কথাটার মানে 'ঘৃত যুক্ত অন্ন'। বর্ত্তমানে হবিষ্যান্ন বলিতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিরামিষ পবিত্র বস্তু বুঝায়। পবিত্র বস্তু আহার করিলে মন সহজেই পবিত্র থাকে। এই জন্যই বিধবাদের জন্য আহার্য্য বস্তুর বিশেষ নির্ব্বাচন। কিন্তু হবিষ্য করিলেই যে ব্রহ্মচর্য্য হয়, তাহা নহে। হবিষ্য ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তা করে। পরন্তু, হবিষ্য করিয়া যে সকল বিধবা পাড়া জুড়িয়া প্রতিবেশীদের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি করে, স্ত্রীলোক বা পুরুষদের নামে কুৎসা রটনা করিয়া বেড়ায়, অকথা-কুকথার চর্চ্চা করে, অপরের কুকার্য্যে সহায়তা করে, পরনিন্দার বৈঠকে উৎসাহ সহকারে যোগ দেয়, পরের দোষ, পরের ছিদ্র লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য হয় না।

প্রঃ– আহার সম্বন্ধে বিধবার কিরূপ সদাচার পালনীয় ?

উঃ– পবিত্র বস্তু আহার করিবে। ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কোনও

খাদ্য ও পানীয় মুখে তুলিবে না। আহার-কালে মৌনী থাকিবে। কাহারও উচ্ছিষ্ট সেবন করিবে না। অসময়ে বা অপরিমিত আহার করিবে না কিম্বা লোভ পূর্ব্বক কোনও বস্তু গলাধঃকরণ করিবে না। কোনও খাদ্যের প্রতি লোভ জন্মিলে তখনকার মত তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং লোভ জয় হইবার পরে তাহা আহার করিবে। অনেক বিধবা নিরর্থক দেহকে ক্ষুধায় কষ্ট দিয়া থাকেন ; তাহা ধর্ম্মবৃদ্ধিকরও নহে, প্রশংসনীয়ও নহে। রিপুদমনই উদ্দেশ্য, আত্মহত্যা উদ্দেশ্য নহে।

প্রঃ– আহার্য্য দ্রব্য কিভাবে নিবেদন করিতে হইবে ?

উঃ– প্রথমতঃ তিনবার প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ পূর্ব্বক আহার্য্য বস্তুতে তিনটি জলের ছিটা দিবে। তৎপর খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মন ভ্রূ-মধ্যে রাখিয়া তিনটি ধীর শ্বাসে ও দুইটি ধীর প্রশ্বাসে মনে মনে ভগবানের মঙ্গলময় নাম জপ মোট পাঁচবার করিবে। তৎপরে করতলে জল লইয়া অর্থ ভাবনাপূর্ব্বক **"ওঁ জগন্মঙ্গলাহং ভবামি" "আমি জগতের মঙ্গলকারিণী হইতেছি"**✻ এই মন্ত্র তিনবার মনে মনে উচ্চারণ করিয়া গণ্ডূষ গ্রহণ করিবে। আহার্য্য গ্রহণ কালে গ্রাসে গ্রাসে ভগবানের নাম অথবা **"ওঁ জগন্মঙ্গলাহং ভবামি"** মন্ত্র জপ করিবে। আহার শেষ হইলে পুনরায় এক গণ্ডূষ জল লইয়া তিনবার জগন্মঙ্গলমন্ত্র † জপ করিয়া তাহা গ্রহণ করতঃ পাত্রত্যাগ করিবে। পাত্রত্যাগ করিবার পরে আর আহার

✻ এই জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প করিবার সময়ে ক্রম অনুযায়ী পরিভ্রমণও তিনবার করা যাইতে পারে। পরিভ্রমণ করিতে হইলে এই মন্ত্র জপের সংখ্যা নির্দ্ধারিত রাখার প্রয়োজন নাই। তিনবার পরিভ্রমণ সম্পূর্ণ করিতে যতবার মন্ত্র জপ প্রয়োজন, ততবারই করা যাইতে পারে। পরিভ্রমণ ক্রমের জন্য "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" দ্রষ্টব্য।

† এই সময়ে মন নাভিমূলে রাখিবে।

করিবে না। পরিত্যক্ত পাত্রকে উচ্ছিষ্ট জানিবে।

প্রঃ– সাধারণ পানীয় বস্তু কি ভাবে নিবেদন করিতে হইবে ?

উঃ– একবার ভক্তিভরে ইষ্টনাম স্মরণ করিলেই সাধারণ পানীয় বস্তু নিবেদিত হইয়া থাকে। বহুবার স্মরণে ভক্তি বাড়ে।

প্রঃ– বিধবার পক্ষে কিরূপ দৈহিক সদাচার পালনীয় ?

উঃ– দেহকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবে। এমন কি নখের ডগাটিতে পর্য্যন্ত ময়লা জমিতে দিবে না। মনে রাখিবে তোমার দেহ ভগবানের মন্দির। ইহাকে অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন বা অপবিত্র হইতে দিতে পার না। পারতপক্ষে অপর কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করিবে না। কেননা, অপবিত্র স্পর্শের মধ্য দিয়া অজ্ঞাতসারে অপবিত্র চিন্তা সংক্রামিত হইয়া থাকে। পুরুষের শয্যায় বা সধবা স্ত্রী-লোকেরা যে শয্যায় স্বামী সহ শয়ন করে, তাহাতে কখনও শয়ন করিবে না বা বসিবে না। রজস্বলা স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না বা তাহার পরিহিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবে না। অলসতা সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিবে। কখনও অত্যধিক শ্রম করিতে হইলে তজ্জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিও না, বরং কখনও বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হইলেই প্রমাদ গণিও। কারণ, **আলস্যের মত চরিত্রের শত্রু, সংযমের শত্রু, পবিত্রতার শত্রু, আর নাই। আলস্য সর্ব্ববিধ কুচিন্তা, কুবাক্য ও কুকার্য্যের জনক**। কখনও হাতে কাজ না থাকে, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ বা শিল্প-কার্য্য করিয়া সেই সময়টুকু সদ্ব্যবহারে আনিবে।

প্রঃ– বিধবার পক্ষে কিরূপ বাচিক সদাচার পালনীয় ?

উঃ– কুৎসিত বিষয়ে কোনও আলাপ-আলোচনা করিবে না, কে কোথায় লুকাইয়া লুকাইয়া কি কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, সেই বিষয়ে কোনও কথা কদাপি জিহ্বাগ্রে আসিতে দিবে না। পরনিন্দা,

পরচর্চ্চা, বৃথা কথা, তর্কাতর্কি, বহুভাষিতা, রুক্ষকথা, ক্রুদ্ধ ভাষা, অপ্রিয় প্রসঙ্গ প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে। কাহারও সহিত বিবাহিত জীবন সম্পর্কিত কোনও হাসি-ঠাট্টা, তামাসা, বিদ্রূপ, রসিকতা, শ্লেষ বা রঙ্গব্যঙ্গ করিবে না,—কেননা, ব্রহ্মচারিণী বিধবার মনে এই সকলের মধ্য দিয়াই কামচিন্তা অলক্ষিতে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং অজ্ঞাতসারে ভোগ-বাসনা জাগরিত করিয়া তাহাকে ব্রতভঙ্গ করিতে উত্তেজনা দেয়। নিষ্প্রয়োজনে কথা বলার অভ্যাস বিশেষ যত্ন-সহকারে বর্জ্জন করিবে। কথা বলার অভ্যাস যতই বাড়াইবে, ততই জিহ্বার উপরে তোমার সংযমের শক্তি হ্রাস পাইবে এবং ধীরে ধীরে জগতের যত কুকথা ও যত অবাচ্য বিষয় আসিয়া তোমার জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠান লইবে। ধর্ম্মবিষয়িণী কথা ব্যতীত অপর কোনও বিষয়েই কথা বলিতে হইলে যত্নপূর্ব্বক যত অল্প সম্ভব বাক্যব্যয় করিবে। অধিক বাক্যব্যয় করিলে মানুষ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে, তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা হ্রাস পায়, তাহার সৎসঙ্কল্পসমূহ শিথিলতা প্রাপ্ত হয়।

প্রঃ— বিধবার পক্ষে কি প্রকার শ্রুতি-সংযম আবশ্যক ?

উঃ— কেহ কোনও কদালাপ আরম্ভ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিবে। অনেকে মনে করিয়া থাকে,—"অন্য লোকে কুকথা বলিতেছে বলুক, আমার শুনিলে আর দোষ কি, আমি নিজে ত' আর কুকথা কহিতেছি না ?" কিন্তু এইরূপ মনে করার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর নাই। সৎকথা শুনিতে শুনিতে যেমন মানুষের অপবিত্র মনও পবিত্রতা লাভ করে, অসৎকথা শুনিতে শুনিতে তেমন পবিত্রচেতা ব্যক্তিরও মন অপবিত্রতার কদর্য্য অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত হইয়া যায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনও কুৎসিত কথা শ্রবণে পৌছিলে কর্ণকুহর হস্ত দ্বারা রুদ্ধ করিয়া অবিরাম ও প্রাণপণে

ইষ্টনাম জপ করিতে থাকিবে।

প্রঃ– বিধবার পক্ষে কি প্রকার দৃষ্টি-সংযম আবশ্যক ?

উঃ– যে দৃশ্য, যে ছবি বা যে ব্যক্তিকে দর্শন করিলে চিত্তে অপবিত্র ভাবের উদয় হয়, তাহার দিকে ভ্রমেও দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিবে না। স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য-ব্যবহার, ইন্দ্রিয়-সুখ-রত পশুপক্ষীর আচরণ প্রভৃতি প্রাণান্তেও দর্শন করিবে না। দৈবাৎ অনিচ্ছাক্রমে কোনও কুদৃশ্য চক্ষে পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ প্রদীপ্ত সূর্য্যের দিকে তাকাইবে এবং চক্ষু ঝলসিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্য-দর্শন করিতে করিতে অবিরাম ইষ্টনাম স্মরণ করিবে। রাত্রি বা মেঘাচ্ছাদন হেতু সূর্য্যদর্শন সম্ভব না হইলে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন দর্শন করিতে করিতে ইষ্টনাম জপ করিতে থাকিবে। কোথাও কোনও স্বামী-স্ত্রী নিরিবিলি অবস্থান করিলে চেষ্টা-পূর্ব্বক নিজেই তাহাদের সান্নিধ্য বর্জ্জন করিয়া চলিবে– কারণ নরনারীর প্রিয়-প্রিয়া-ভাব-প্রণোদিত কোনও আচরণই তোমার দর্শন করা উচিত নহে।

প্রঃ– কখনও প্রবল ভোগলিপ্সা জাগ্রত হইলে কি কর্ত্তব্য ?

উঃ– দেহের অনিত্যতা চিন্তা করিবে। যে দেহ ভোগ-সুখের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই দেহ কয় দিন থাকিবে, তাহা জান কি ? আজ এই সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বেই যে দেহের শেষ হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি ? আগামী কল্য সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই শ্মশানে পুড়িয়া সোণার অঙ্গ ছাই হইবে না, তাহার স্থিরতা কোথায় ? এই ভাবে শরীরের ক্ষণভঙ্গুরতা চিন্তা করিতে করিতে ভোগ-লিপ্সাকে দমন করিবে। তৎপরে কিয়ৎকাল ইন্দ্রিয়-সংযম-সহায়ক ও মনঃস্থৈর্য্য-বিধায়ক "মহা-মুদ্রা", "অশ্বিনী-মুদ্রা", "যোনি-মুদ্রা", ও "সঞ্জীবনী-মুদ্রা" * অভ্যাস

---

* এই সকল মুদ্রার বিবরণের জন্য "সংযম-সাধনা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। মুদ্রাগুলির বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব হইল না।

করতঃ মন শান্ত ও স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত ইষ্টনাম জপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এই ভাবে ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে করিতে এমন পবিত্রতাময় স্বভাব তোমার লাভ হইবে যে, কিছুতেই আর কখনও ভোগলিপ্সা অন্তরে জাগ্রত হইবে না।

প্রঃ– ভোগ লিপ্সাকে দমন করিতে হইলে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক ?

উঃ– সকামভাবে কোনও পুরুষ বা তাহার আলেখ্য দর্শন করিবে না। পুরুষের সহিত বৃথা আলাপন করিবে না বা তাহার সহিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিবে না। পুরুষের দেহ স্পর্শ করিবে না বা তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনার রত হইবে না। পুরুষ বা কামুকী নারীর শয্যা, বস্ত্র বা পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিবে না। নারী বা পুরুষের, বালক বা বালিকার, পশু বা পক্ষীর গুপ্ত ইন্দ্রিয় নিরীক্ষণ করিবে না। যার তার সংসর্গে অবস্থান করিবে না, দাম্পত্য সুখের বর্ণনাপূর্ণ বা ইন্দ্রিয়-লালসার উদ্দীপক পুস্তক পাঠ করিবে না। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির যে অংশ অশ্লীল, তাহা অধ্যয়নে বিরত হইবে, যা-তা নাট্যাভিনয় বা প্রণয়-সঙ্গীত শ্রবণ করিবে না। রাত্রি-জাগরণ করিবে না, অতি নিদ্রায় আসক্ত হইবে না, মস্তিষ্কের উত্তেজনাকারক মশলাদি সংযুক্ত উগ্রবীর্য্য আহারীয় গ্রহণ করিবে না, পচা, বাসী ও দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য খাইবে না, বিলাসিতা * করিবে না, আটা-সোটা পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবে না, ভালবাসা বা প্রীতি-প্রণয় দেখাইবার জন্য কাহাকেও আলিঙ্গন বা চুম্বন করিবে না। আর একটী কথা বিশেষভাবে মনে রাখিবে যে, মনকে কখনও নিম্নাঙ্গে যাইতে দিবে না; সর্ব্বদা

---

* শরীররক্ষার পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত খাদ্য, বস্ত্র, শয্যাদির আড়ম্বর বৃদ্ধি করার নাম বিলাসিতা।

তাহাকে ভ্রূ-মধ্যে রক্ষা করিবে।

প্রঃ– পুরুষের প্রতি ব্রহ্মচারিণীর আচরণ কি প্রকার হওয়া উচিত ?

উঃ– পুরুষের সহিত বৃথা–ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জনে তোমাকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে। অগঠিত অবস্থায় পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ বিষতুল্য সুতরাং চরিত্র-গঠনের প্রথম সময়টাতে সর্ব্ব-প্রযত্নে একের সঙ্গ বর্জ্জন করিয়াই অপরের চলা উচিত। কিন্তু মনুষ্যত্বের সাধনা বড় বিরাট সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে কেবল নিজের চরিত্রটীর গঠন করিলেই চলে না, চরিত্র-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পরার্থেও জীবন উৎসর্গ করিতে হয়। দরিদ্র যেখানে ক্ষুধায় কাঁদে, রুগ্ন যেখানে ব্যাধির যন্ত্রণায় কাতর-অধীর হয়, মনুষ্যত্বের সাধক ও সাধিকাকে সেইখানেও শান্তি লইয়া যাইতে হয়, সান্ত্বনা প্রদান করিতে হয়। এই সকল স্থলে অনেক সময়ে পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষের সংশ্রব অবশ্যম্ভাবী, এই সকল স্থলে মহিলা কর্ম্মীর পক্ষে সম্যগ্‌রূপে পুরুষ বর্জ্জন করিয়া চলা সম্ভব নহে। সুতরাং এইখানে স্ত্রীলোককে সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে,– পুরুষকে ভয় করিয়া নিজের জগৎ-কল্যাণ-সামর্থ্যকে পল্লী-গৃহের অন্ধকারময় কোণে লুকাইয়া রাখিলে চলিবে না। কিন্তু নিজের চরিত্র-রক্ষার দিকে ষোল আনা দৃষ্টি রাখিয়া, নিজের সতী-মর্য্যাদাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ রাখিয়া মহিলাকর্ম্মীকে অগ্রসর হইতে হইবে। কোনও ক্ষুধার্ত্ত পুরুষকে যদি আহার্য্য দিতে হয়, তবে পুরুষটীর ক্ষুধা বিদূরণের পরে আর তাহার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজন নাই। ঘরে অতিথি আসিয়াছে, তাহার আহারের পূর্ণ সুবন্দোবস্ত নারীকেই করিতে হইবে কিন্তু আহার

শেষ হইবার পরে তাহার স্বচ্ছন্দ বিশ্রামের ব্যবস্থাদি ব্যতীত অতিথির প্রতি নারীর আর কোনও প্রত্যক্ষ কর্ত্তব্য নাই,—যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বাড়ীর পুরুষদের। আতিথেয়তা পরম ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুর সংসারে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু অতিথির সৎকারের জন্য শ্রেষ্ঠিপত্নীকে বিল্বমঙ্গলের প্রতি যাহা করিতে হইয়াছিল, তাহা সতীত্ব-মর্য্যাদার বিরোধী। কোনও রুগ্ন পুরুষকে যদি সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়, তবে তাহার রোগারোগ্যের পরে আর তাহার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখা মহিলা কর্ম্মীর উচিত নহে। কারণ স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া অহরহ লোকের মনে ভোগ-বাসনার প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে। অনেক সময় দেশসেবায় এবং সমাজ-কল্যাণ মূলক কার্য্যে ব্রহ্মচারিণীকে পুরুষ-কর্ম্মীর সহযোগিতা করিতে হয়। কিন্তু এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে যদি কোনও প্রকারে একের প্রতি অন্যের তামসিক অনুরাগ সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা জন্মে, তাহা হইলে ব্রহ্মচারিণীর উচিত প্রথমতঃ সেই অনুরাগের মূলোচ্ছেদ করা এবং উপযুক্ত চেষ্টার পরেও তাহা অসাধ্য হইলে সেই দেশ-সেবা-মূলক কর্ম্ম হইতে সরিয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করা এবং অন্যতর ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের সেবা করা। কারণ, পুরুষের চরিত্রের পতন ঘটিলে সে তবু নানা প্রকার চেষ্টার ফলে আবার জীবনকে উন্নতির দিকে টানিয়া নিতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোক যতই প্রতিভাবতী হউক, যতই বুদ্ধিমতী হউক, যতই অধ্যবসায়শালিনী হউক, একবার তাহার চরিত্রগত পতন ঘটিলে পুনরায় অভ্যুত্থান লাভ করা তাহার পক্ষে সুদূর-পরাহত ব্যাপার। কেননা, স্ত্রীলোকের পতন হইলে তাহার অভ্যুত্থানের অনুকূল অবস্থা ভারতবর্ষের বর্তমান সামাজিক জীবনে বলিতে গেলে আদৌ নাই। এইজন্যই ব্রহ্মচারিণী কর্ম্মী-মা-দের সর্ব্বদা

মনে রাখা উচিত যে, বরং তাহাদের দ্বারা আপাততঃ দেশের কোন মস্ত বড় কার্য্য বা সেবা না হউক, তথাপি যেন তাহারা কামমোহের বা মিথ্যাযুক্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া ভ্রষ্টা না হয়, কলঙ্কিনী না হয়। একদল লোক বলিয়া থাকে যে, দেশের সেবা করিবার জন্য যদি চরিত্রেও জলাঞ্জলি দিতে হয়, তবে তাহাও দেওয়া উচিত। কিন্তু এই সকল কথা নিরতিশয় নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। প্রকৃত-প্রস্তাবে চরিত্রহীন নর-নারী দেশের অতি অল্প সেবাই করিতে পারে এবং তাহাদের সেবার সুফল দেশমধ্যে অতি অল্পকালাই জীবিত থাকে। সুতরাং ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে চরিত্রকেই বড় বলিয়া জানা কর্ত্তব্য এবং চরিত্রের জন্য আবশ্যক হইলে দেশ সেবাকার্য্যের সহযোগী পুরুষদিগকে বর্জ্জন করাও কর্ত্তব্য। "দেশ সেবা" কথাটার মধ্যে একটা অত্যাশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি আছে। মনুষ্যত্ব যার বিন্দুমাত্রও আছে, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার প্রেরণা তাহাকে আকুল-অধীর করিয়া তোলে। জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্যের দায়িত্ব মানুষের এতই বিরাট যে, প্রাণে যদি মনুষ্যত্বের সম্পদ এক কণাও সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে দেশের দুঃখ, দেশের দুর্দ্দশা, দেশের অধঃপতন মানুষকে ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত করিয়া তোলে। বিশেষতঃ যাহারা সংযমাভ্যাসী, তাহাদের চিত্তভূমিতে স্বদেশ-প্রেমের বন্যা বহে উদ্দামতর আবেগে, যার চরিত্র যত বিশুদ্ধ, স্বদেশ-প্রেম হয় তার তত গভীর। কিন্তু স্বদেশ সেবা-মূলক কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে যাইয়া যদি চরিত্রচ্যুতির সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রযত্নে চরিত্র-রক্ষার দিকেই দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। কেননা, যে নারী চরিত্রকে সম্যক্ বিশুদ্ধ রাখিতে সমর্থা হয়, তাহার সংস্পর্শে অপরাপর নারীদের মধ্যেও বিশুদ্ধ-চরিত্রতা সংক্রামিত হয়। ইহার ফলে জাতির মনুষ্যত্বের দীপ্তি বর্দ্ধিত হয়।

যে জাতির জননী সমাজ যত পবিত্র-চরিতা, সে জাতির দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা তত উন্নত ও তত তেজোবীর্য্য-মণ্ডিত হয়। সুতরাং চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষণের দ্বারা নারীজাতি প্রকৃত প্রস্তাবে দেশেরই সেবা করেন, সমাজেরই বলবর্দ্ধন করেন। দেশের কাজের আহ্বানে প্রয়োজন-স্থলে নারীকেও রণরঙ্গিণী সাজে যোদ্ধ্রীবেশে মৃত্যুসঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে কপালিনী কালীর মত রণ-তাণ্ডবে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া শত্রু-সৈন্য দলিত-মথিত করিয়া ছুটিয়া যাইতে হইতে পারে, প্রয়োজন-স্থলে গজ-বাজি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া করযুগে বর্শা-কৃপাণ ধরিয়া বক্ষতল লৌহ-বর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া নারীকেও বহ্নিবর্ষী কামানের মুখে নির্ভীক চিত্তে আসিয়া দাঁড়াইতে হইতে পারে, কিন্তু চরিত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়া যদি ইহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যেখানে পুরুষ-জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে না, এমন কোনও নীরব নিভৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সরল অনাড়ম্বর ভাবে দেশের অন্যবিধ সেবা করিলেও যে দেশমাতা তাহা গ্রহণ করিবেন না বা সমাজের তাহাতে কোনও প্রকৃত উপকার হইবে না, তাহা নহে। স্ত্রীলোকদিগকে আরও এক ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত গভীর ঘনিষ্ঠতাতে আসিতে হয়। ইহা হইতেছে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র। যে যাহার নিকটে সাধন গ্রহণ করে, সে তাহার নিকট নিজ জীবনটাকে একেবারে উন্মুক্ত করিয়া ধরে, নিজের অন্তরটাকে একেবারে খুলিয়া দেখায়, চিত্তের মধ্যে কোনও কপটতা, কোনও গোপনতা না রাখিয়া হৃদয়-পদ্মের প্রত্যেকটী পাপ্ড়ী একেবারে মেলিয়া দেয়। ইহা কোনও সমাজ বিধান বা নৈতিক অনুশাসনের ফলে নহে, ইহা হইতেছে গুরু-শিষ্যের স্বাভাবিক মনোধর্ম্ম। কিন্তু অনেক সময়ে স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষ-গুরুরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে

হয়, কেননা, উপযুক্ত স্ত্রীগুরু সুলভ নহেন। ব্রহ্মচারিণী বিধবা সাধন ব্যতীত কিসের অবলম্বনে জীবন গঠন করিবে ? সাধন ছাড়া কে কবে জীবনে প্রকৃত উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে ? আর, মন-গড়া পথে চলিয়া নিজের খেয়াল মত প্রণালী অনুসারে কাজ করিয়া কে কবে সহজে উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিয়াছে ? নিজ নির্ব্বাচিত সাধন-পন্থায় অধিকাংশ লোকেরই পূর্ণ আস্থা আসে না! সুতরাং গুরুর সহায়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ব্রহ্মচারিণীকে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিতে হইবে—ইন্দ্রিয়-সংযমের শক্তিবর্দ্ধনের জন্য, ব্রহ্মচর্য্য পালনের সহায়তার জন্য, ভগবৎ-সাধনার প্রকৃত সুপথ পাইবার জন্য, ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবার জন্য। অন্য পুরুষ ত' দূরেরই কথা, গুরুদেবেরও শিক্ষা-দীক্ষা যদি ব্রহ্মচারিণীকে ব্রত-চ্যুত বা সংযম ভ্রষ্ট করিতে চাহে, তাহা হইলে গুরু-ত্যাগ করিবার জন্য পর্য্যন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যাহার সংস্পর্শ, প্রভাব, উপদেশ, আচরণ বা দৃষ্টান্ত শিষ্যার সংযম-নাশক, তাহাকে বর্জ্জন করিলে ব্রহ্মচারিণীর কোনও অপরাধ ত'হয়ই না বরঞ্চ ধর্ম্ম রক্ষিত হয়, পুণ্য সঞ্চিত হয়। বৈষ্ণবদের মধ্যে নাকি একটা গুপ্ত সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মধ্যে বিধবারা দেহ-দান করিয়া ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ দ্বারা গুরু-সেবা করিয়া থাকে। বলাই বাহুল্য যে, প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী কখনই এই ভাবে গুরুসেবা করিবে না। গুরুদেবের প্রদত্ত সাধন-প্রণালী অবলম্বনপূর্বক আত্ম-জ্ঞান বা ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করাই প্রকৃত গুরু-সেবা। গুরুর পা টিপিলেই গুরু-সেবা হয় না,—ত্যাগ, সংযম, সত্য, পবিত্রতা ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করার নামই গুরু-সেবা, ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের নামই গুরু-সেবা, ভগবানে ভক্তি করার নামই গুরু-সেবা, নাম-সাধনে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা রক্ষা

করার নামই গুরু-সেবা।

প্রঃ– কাহাদের সঙ্গলাভ বিধবাদের চরিত্রের উন্নতিজনক ?

উঃ– যাহারা সৎকথা শুনিতে আগ্রহবতী, এইরূপ কুমারীদের। পল্লীতে যতগুলি কুমারী মেয়ে আছে, তাহাদের ভিতরে অতি সন্তর্পণে ভাল ভাল মেয়েদের বাছিয়া লইবে এবং তাহাদের মনকে সৎপথে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সাধ্যমত সৎপ্রেরণা ও সদুপদেশ দিতে থাকিবে। ইহারা যৌন-ব্যাপার জানে না, স্ত্রীপুরুষ-ঘটিত ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব বোঝে না, ইহাদের ভোগ-বাসনা, বিলাস-লালসা, নীচ-প্রবৃত্তি জাগরিত হয় নাই। ইহারা অনাঘ্রাত পুষ্পের মত সুন্দর, নিষ্পাপ ও মধুর। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিবে, ইহাদের সঙ্গ করিতে গিয়া যেন আবার মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িও না।

প্রঃ– সধবাদের সহিত বিধবাদের কিভাবে মিশা উচিত ?

উঃ– যে সকল সধবা ধর্ম্মপরায়ণা, সাধনশীলা, সংযম-শুদ্ধা, প্রিয়-ভাষিণী ও সদ্‌বুদ্ধি-সম্পন্না, তাহাদের সহিত তোমাদের আত্মোন্নতি সাধনের জন্যই অকপটে মিশা উচিত। যে সকল সধবা তদ্রূপ নহে, অথচ চেষ্টা করিলে ধর্ম্মের পথে আসিতে পারে, সাধন–ভজনের প্রতি অনুরাগিণী হইতে পারে, অপ্রিয়ভাষণ ত্যাগ করিতে পারে, তাহাদিগের সঙ্গে মিশিবে– তাহাদের জীবনকে উন্নতির পথে টানিয়া আনিবার শুভ অভিপ্রায় লইয়া। আর, যে সকল সধবা ধর্ম্মহীনা, সাধন-দ্বেষিণী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসিনী কুভাষিণী, অসদ্‌বুদ্ধি-সম্পন্না, মন্দমতি ও কামাসক্তা এবং কিছুতেই যাহাদের চরিত্রের উন্নতি-সাধন সম্ভবপর নহে, তাহাদের সঙ্গ বিষধর ভুজঙ্গবৎ পরিত্যাগ করিবে।

প্রঃ– গৃহস্থিত আত্মীয়গণের প্রতি বিধবার ভাব কিরূপ হইবে ?

উঃ- আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিধবা অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিবে। কাহারও প্রতি "আমার" "আমার" বোধ জাগিতে দিবে না। মনে রাখিবে, সবই ভগবানের, তোমার বলিতে ত্রিজগতে কোথাও কিছুই নাই। একমাত্র ভগবান্ই তোমার আপন জন, তাঁহার পবিত্র নামই তোমার একমাত্র সম্পত্তি। আর যত মানুষ, যত বস্তু, সবই ভগবানের। তুমিও সংসারের কাহারও নহ। ভগবান্ই তোমার একমাত্র অধিস্বামী, তুমি একমাত্র ভগবানেরই জিনিষ, একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত অপর কাহারও তোমাকে দাবী করিবার অধিকার নাই। তবে, তুমি যে সংসারের সেবা নতমুখে অক্লান্ত ভাবে করিতেছ, তার কারণ, এ সংসার ভগবানেরই জিনিষ।

প্রঃ- কোনও বিধবার যদি পরলোকগত স্বামীর দ্বারা লব্ধ কোনও পুত্র-কন্যা থাকে, তবে তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ?

উঃ- পরলোকগত স্বামীর সহিত নিজের যে কোনও প্রকার ইন্দ্রিয়-ঘটিত মিলন সম্পর্ক ছিল, অবিরাম নাম-সাধনার দ্বারা প্রথমে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হও। তারপরে এই পুত্র ও কন্যাগুলি যে তোমার জঠরে জাত হইয়াছে, অবিরাম নাম-সাধনার দ্বারা তাহাও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হও। তৎপরে এই পুত্রকন্যাগুলিকে শ্রীভগবানেরই সন্তান-সন্ততি জ্ঞান করিয়া তাঁরই বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ জ্ঞানে সযত্নে ইহাদের প্রতি যাবতীয় পার্থিব কর্ত্তব্য পালন কর এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সুগঠিত করিবার জন্য চেষ্টা কর।

প্রঃ- নিঃসন্তানা বিধবা পোষ্যপুত্র রাখিবে কি না ?

উঃ- ইহা যার যার রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু পারলৌকিক মঙ্গলের

কথা যদি বল, তবে পরামর্শ দিব, মায়ার বেড়ি সাধিয়া পরিতে যাইও না।

প্রঃ– সম্পত্তি-শালিনী বিধবা পোষ্যপুত্র না রাখিলে তাহার সম্পত্তির কিরূপ গতি হইবে ?

উঃ– বিধবার যদি সম্পত্তি থাকেই, তবে তাহার সদ্‌ব্যবহার হইবে, নারীজাতির, বিশেষতঃ বিধবাদেরই কল্যাণে তাহা নিয়োজিত করিয়া। কিন্তু সুতীব্র সাধন ব্যতীত সহজে কাহারও ত্যাগ-শক্তি জাগে না, সুতরাং সম্পত্তির কোনও রূপ ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে ভগবৎ-সাধনের দ্বারা আগে নিজের চিত্তকে নির্ম্মল কর। নির্ম্মল চিত্ত-দর্পণে প্রকৃত সদ্‌ব্যবহারের পন্থা আপনিই ফুটিয়া উঠিবে, কাহারো উপদেশ ব্যতীতই নিজ কর্ত্তব্য তখন বুঝিতে পারিবে। সলা-পরামর্শ করিয়া ত্যাগ হয় না।

প্রঃ– যে সকল বিধবার পুনর্বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের প্রতি ব্রহ্মচারিণী বিধবার কিরূপ আচরণ হওয়া উচিত ?

উঃ– নিন্দারও নহে, বিদ্বেষেরও নহে, ঘৃণারও নহে, তাচ্ছিল্যের নহে, অবজ্ঞার নহে, অনাদরের নহে। ইহারা গুপ্তভাবে পাপের অনুশীলন না করিয়া প্রকাশ্যে সধবা-জীবনের কর্ত্তব্যকে গ্রহণ করিয়া সমাজের হিতই করিয়াছে। সুতরাং ইহাদের প্রতি তোমাদের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে সাধারণ সধবাদের প্রতি প্রযুক্ত ব্যবহারের ন্যায় অনিন্দনীয় হইবে।

প্রঃ- কলহ-পরায়ণ আত্মীয়দের সংসর্গে পড়িলে নিরীহ-প্রকৃতি বিধবারও মধ্যে কলহ-পরায়ণতা সঞ্জাত হয়। ইহার প্রতিকার কি ?

উঃ– নিয়ত ভগবানের মঙ্গলময় নামের সেবা। নামের সেবা বহির্ম্মুখ মনকে অন্তর্ম্মুখ করে, অপরের বিদ্বেষ-কটু অপমান-বাক্যের প্রতিও চিত্তকে উদাসীন করে, ফলে সহ্য করিবার ক্ষমতা, উপেক্ষা করিবার

ক্ষমতা, চুপ করিয়া থাকিবার ক্ষমতা বাড়িতে থাকে। ভগবানের নামে মন মজাইতে পারিলে সংসারের সহস্র দুঃখ তুচ্ছ মনে হয়, ব্যথা, বেদনা, শোক, তাপ সুদূরে পলায়ন করে, প্রাণ মন, নিয়ত এক অতুলনীয় প্রেমরসের আস্বাদনে মাতোয়ারা হইতে থাকে। তাই নামসেবাকেই পরমপন্থা বলিয়া জানিবে এবং নামের বলেই ক্রোধ, বিদ্বেষ, কলহপ্রিয়তা, পরানিষ্টবুদ্ধি, ক্রূরতা ও কুটিলতা জয় করিবে। কথায় বলে,–বোবার শত্রু নাই।

প্রঃ– পরলোকগত স্বামীকেই পরমেশ্বর বলিয়া ভাবনা করা যায় কি ?

উঃ– রুচি থাকিলেই হয়। স্বর্গীয় স্বামীকে পরমেশ্বর বলিয়া ভাবনা করিতে হইলে মনে মনে এইরূপ করিবে যেন তিনি সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁহা ছাড়া আর কিছু নাই, চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-তারা-চয় তাঁহারই আদেশে নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিতেছে। ভাবিতে হইবে,–অসীম পরমব্রহ্ম দুই দিনের জন্য মানুষ রূপ ধরিয়া স্বামী-রূপে আসিয়া তোমার কাছে ধরা দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ত' মানুষই নহেন, তিনি যে কোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরমাত্মা, তাই তিনি নিজেকে পুনরায় সর্ব্বদিকে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্ববস্তুতে বিস্তারিত করিয়াছেন, অন্তহীন, সীমাহীন, মনোবাক্যের অগোচর পরমসত্তা হইয়াছেন।

প্রঃ– পরলোকগত স্বামীকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা না করিলে কোনও দোষ হয় কি ?

উঃ– স্বামীকে পরমেশ্বর ভাবিতে হইবে, এমন কোনও মাথার দিব্য নাই। যে ভাবিতে পারে, সে লাভবতীই হয় ; যে ভাবিতে না-পারে বা না চাহে, সে তাহাতে ক্ষতিগ্রস্তা হয় না। মোটকথা ভগবানকে জীবনের অধীশ্বর বলিয়া জানা চাই, এক্ষণে তাহা স্বামীর চিন্তার মধ্য দিয়াই হউক অথবা স্বামী-চিন্তা ব্যতিরেকেই হউক।

সধবা-অবস্থায় যাহাদের স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল এবং যাহাদের ভালবাসার মধ্যে, অকৃত্রিমতা ও পবিত্রতা ছিল, তাহাদের পক্ষে স্বামীকে ঈশ্বর-বোধে ধ্যানার্চ্চনাদি করিলে ভগবদ্‌ভক্তি জন্মিবার অনেক সময় সহায়তা হয়। যাহাদের এরূপ হয়, তাহাদের পক্ষে পরলোকগত স্বামীতে ঈশ্বর-বুদ্ধি স্থাপন কর্ত্তব্য। যাহাদের অবস্থা এইরূপ নহে, তাহাদের পক্ষে জোর-জবরদস্তি করিয়া স্বামীকে ঈশ্বর ভাবা নিষ্প্রয়োজন।

প্রঃ— স্বামীকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা করিতে যদি রুচি যায়, তাহা হইলে কোন্ মন্ত্রযোগে স্বামীর ধ্যান করা কর্ত্তব্য ?

উঃ— দীক্ষা-প্রাপ্ত ইষ্ট-মন্ত্র যোগেই স্বামীর ধ্যান করিবে। সাধন করিতে গিয়া বারংবার বিভিন্ন রূপের প্রতি রুচি ধাবিত হইতে পারে, কিন্তু তার জন্য ইষ্টনাম পরিবর্ত্তিত করিতে হয় না। স্বামীর রূপ চিন্তনে যখন প্রাণের স্বাভাবিকী রুচি জন্মিবে, তখন তাঁহাকে সর্ব্বশক্তি-স্বরূপ পরমানন্দ-নিকেতন ব্রহ্ম জানিয়াই ভক্তিভরে নাম জপিতে থাকিবে। সাধন-জীবনে অখণ্ড-দীক্ষিত সাধক-সাধিকাগণকে যে কত প্রকার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহা বলিবার নহে। কখনও তোমার রুচি কালীমূর্ত্তি ধ্যানের প্রতি, কখনও কৃষ্ণমূর্ত্তির প্রতি, কখনও শিবমূর্ত্তির প্রতি, কখনও দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির প্রতি ধাবিত হইতে পারে, কিন্তু যখনই যাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান কর না কেন, নাম জপিতে হইবে সেই একটীই, নামের মধ্যে আর অদল-বদল চলিবে না। হয় ত' পরশ্ব তোমার কালীমূর্ত্তিতে রুচি ছিল, তখন অখণ্ডনামযোগে কালীমূর্ত্তিই ধ্যান করিয়াছ ; কাল হয়ত তোমার কৃষ্ণরূপে অনুরাগ ছিল, তখন অখণ্ড-নামযোগে কৃষ্ণরূপই ধ্যান করিয়াছ ; আজ হয়ত তোমার স্বামীর মূর্ত্তিতে ঈশ্বরবুদ্ধি উদ্দীপিত হইয়াছে, আজ

তোমাকে স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে ঐ অখণ্ড-নামের সহযোগে। এই ভাবে কিছুকাল সাধন করিতে করিতে দেখিবে, জগতের সকল কল্পিত ও বাস্তব মূর্ত্তি লয় পাইয়া একমাত্র নাম-ব্রহ্মের ভিতরে সব আসিয়া ডুব মারিয়াছে এবং নামই একমাত্র সত্য বস্তু, একমাত্র নিত্য বস্তু, অমৃতময় অখণ্ড-বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। বাহিরে শত শত বার অভিনিবেশ স্থাপন করিতে উদ্যম প্রয়োগ কর, তাহা ত' অখণ্ড-নামকেই সবকিছুর অন্ত বলিয়া জানিবার বুঝিবার অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয় !

প্রঃ– দীক্ষাদাতা গুরুকে স্বামী বলিয়া ভাবা যায় কিনা ?

উঃ– না। নিজ বিবাহ লব্ধ স্বামী ব্যতীত অপর কোনও পুরুষের প্রতিই স্বামী-ভাব আরোপ করিতে পার না। অপর সকল পুরুষকে হয় পিতা নতুবা সন্তান বলিয়া ভাবিতে হইবে। এমন-কি, নিজ স্বর্গগত স্বামীর বিষয়ে চিন্তা করিতেও তাঁহার সম্পর্কে কাম-চিন্তা করিবার অধিকার কোনও ব্রহ্মচারিণী বিধবার নাই। কাম-গন্ধহীন ভাবে স্বামি-চিন্তা করা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে স্বামীর বিষয়ে ভাবাও বর্জ্জন করিতে হইবে।

প্রঃ– মৃত স্বামীকে স্মরণ করিয়া কামভাব জাগ্রত হইলে কি কর্ত্তব্য ?

উঃ– (১) স্বামীকে দেহহীন চিন্ময়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্য্যামী, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, পবিত্রতাস্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবে এবং নিজেকেও দেহের অতীত ব্রহ্মময়ী বলিয়া কল্পনা করিতে থাকিবে।

(২) ভ্রূমধ্যে মনঃ-সন্নিবেশ করিয়া প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকিবে এবং স্বামী-মূর্ত্তির চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তেজঃস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় অভীষ্ট দেবতার ভাবনা ও রূপধ্যান করিতে থাকিবে।

প্রঃ– গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবা যায় কি ?

উঃ– জরুরী কোনও প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ গুরুকে পথ-প্রদর্শক বলিয়া

জান। তাঁহার প্রদত্ত সাধনকে ইষ্ট লাভের পরম-পন্থা জানিয়া ইষ্টনামের সেবাতেই সর্ব্বদা নিরত থাক। যতদিন ঈশ্বর-দর্শন না হইবে, ততদিন ইষ্টনামকেই ঈশ্বরের কৃপা ও প্রতিনিধি বলিয়া জানিবে। ইষ্টনামের মহিমায় তাহার নিত্যনূতন রূপ তোমার নয়নগোচর হইবে, নিত্য নূতন রস তোমার আস্বাদন-গোচর হইবে এবং পরিশেষে ব্রহ্মদর্শন ঘটিবে। নামকেই গুরু, নামকেই ইষ্ট, নামকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জান। সাধন করিতে করিতে যদি গুরুতে আপনা আপনি ইষ্টবোধ আসে, তবে তাহা ক্ষতিকর নহে।

প্রঃ– যদি গুরুর প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি আসিয়া যায়?

উঃ– সাধনের ফলে যদি ইহা আসে আসুক, প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজনও নাই, উপায়ও নাই। সাধনের ফলে যাহা আসিবে, তাহার গমন বা অবস্থান উভয়ই নির্ভর করে সাধনের পরিপক্কতার উপরে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া কখনও মানুষে ঈশ্বর-বুদ্ধি অর্পণ করিও না। চেষ্টা করিয়া কোনও মানুষকে ঈশ্বর ভাবিলে, তাহাতে অপরাধ হয়, ঈশ্বরের মহিমাকে ক্ষুণ্ন করা হয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যদি কাহারও মানুষের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি জন্মে, তবে তাহা প্রতিরোধ করিবারই বা কি উপায়? সাধারণতঃ মানুষের স্বভাবই এই যে, কাহারও ভিতরে অত্যাশ্চর্য্য কিছু দেখিলে, উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন দেখিলে তাঁহাকে ঈশ্বরের অংশ বা অবতার বলিয়া মনে করে। আপনা আপনি এইরূপ ভাব আসিলে তাহাকে অপরাধ ভাবিয়া মনের ভিতরে অস্বস্তি বোধ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি জাগিলে তাহা মনে মনেই সঙ্গোপিত রাখা কর্ত্তব্য, বাহিরে সেই কথা প্রচার করা বা প্রকাশ করা উচিত নহে। কেননা, বাহিরে এরূপ প্রচার অনেক সময়ে ভণ্ডামি বা আত্মপ্রবঞ্চনাতে পর্য্যবসিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের যত রূপ, সবই ভগবানের রূপ, কিন্তু

সম্পূর্ণ রূপ নয়। ব্রহ্মাণ্ডের যত রস, সবই ভগবানের রস, কিন্তু সম্পূর্ণ রস নয়। তাঁর যে সম্পূর্ণ রূপ, তাঁর যে সম্পূর্ণ রস, তাহা তাঁর সুপবিত্র নামের ভিতরে লুক্কায়িত আছে। সুতরাং পৃথিবীর যত জায়গায়ই তুমি ঈশ্বরবুদ্ধি আরোপিত কর না কেন, সাধন যদি করিতেই থাক, তবে দেখিবে, সকল রূপের রসাহরণ করিয়া পরিশেষে তোমার মন নামের ভিতরই ডুবিয়াছে। সুতরাং নামকে নিত্য অবলম্বন জানিও।

প্রঃ– পুরুষজাতির প্রতি সন্তান-ভাব কি প্রকারে আসিবে ?

উঃ– পুরুষ দর্শন করিলেই তৎক্ষণাৎ মনে মনে বলিবে,–"জগদীশ্বর তোমার পিতা, আমি তোমার মাতা"। এইরূপ নিয়ত অভ্যাস করিতে করিতেই সন্তানভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইবে। যুবক বা বয়স্ক পুরুষ দর্শন মাত্রই মনে মনে তাহার শৈশব ও বাল্যের কথা কল্পনা করিতে থাকিবে। ভাবিতে থাকিবে, যে দিন সে ভূমিষ্ঠ হয়, সে দিন সে কতটুকু ছিল, তুমি তাহার মা হইয়া কিভাবে স্তন্য পান করাইয়াছিলে, তাহার বিষ্ঠা মূত্র পরিষ্কার করিয়াছিলে, যেদিন সে হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছিল, সেদিন সে মাকে দেখিয়া কেমন হাসিমুখে আধ আধ বুলিতে "মা-মা" বলিয়া ডাকিয়াছিল, আর তুমি তাহার মা হইয়া কেমন স্নেহ-সহকারে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলে। কোনও পুরুষ দেখিলে তখনই তাহার মায়ের মূর্ত্তিটি কল্পনা করিবে এবং ভাবিতে থাকিবে যেন তাহার মা আর তুমি অভিন্ন, তাহার মায়ের দেহের মধ্যে যেন তুমি প্রবেশ করিয়া আছ, তোমার হাত যেন তাহার মায়ের হাতের ভিতর, তোমার পা যেন তাহার মায়ের পায়ের ভিতরে, তোমার চখ, মুখ, নাক, কাণ যেন তাহার মায়ের চখ, মুখ, নাক ও কাণের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া আছে।

প্রঃ– সকলকেই সন্তান ভাবা যায় কি ?

উঃ– হাঁ, যায়। ব্রহ্মচর্য্যে দৃঢ়তা লাভ হইলে এমনকি নিজ স্বামীকে পর্য্যন্ত সন্তান ভাবা যায়। কুমিল্লার নিকট ত্রিশ নামক গ্রামে বসন্ত সাধু নামক একজন মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি সন্তান-ভাব অর্পণ করিয়াই স্বামীর সর্পদষ্ট মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত রুদ্রাক্ষবাড়ী নামক গ্রামে হরিষ সাধু নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন, যাঁহার স্ত্রী একটীমাত্র সন্তান প্রসবের পর হইতেই স্বামীকে সন্তান বোধে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন এবং মাতৃময়ী স্নেহশীলতার জ্বলন্ত আধাররূপে চতুর্দ্দিকের নারী-সমাজের দৃষ্টান্তস্থানীয়া হইয়া রহিলেন। ত্রিপুরা চণ্ডীদ্বারের "সাধুবাবা" নামক মহাপুরুষের এক গৃহস্থ শিষ্যের জীবনেও এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। পুরুষেরা যেমন স্ত্রীলোকমাত্রকেই চেষ্টা করিলে মা বলিয়া ভাবিতে পারেন, স্ত্রীলোকেরাও তেমন পুরুষ-মাত্রকেই ইচ্ছা করিলে সন্তান বলিয়া ভাবিতে পারেন। অভ্যাসের বলে পুরুষেরা যেমন স্ত্রীলোক-সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার কুচিন্তা ও পঙ্কিল ভোগ-বাসনা বর্জ্জন করিয়া পরমহংসত্ব লাভ করিতে পারেন, অভ্যাসের বলে স্ত্রীলোকেরাও তেমন পুরুষ-সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার কদর্য্য ভাব ও কুৎসিত ইন্দ্রিয়-লালসা পরিহার করিয়া তপঃপ্রতিভাময়ী জগজ্জননীর জগৎপূজ্য মহিমা-সিংহাসনে সমাসীনা হইতে পারেন।

প্রঃ– সন্তান-ভাব কি সকল সময়ে নিরাপদ ?

উঃ– সকল রকম ভাবেরই সদ্‌ব্যবহার ও অসদ্‌-ব্যবহার আছে। সন্তান-ভাবের যতক্ষণ সদ্‌ব্যবহার হইতেছে, ততক্ষণ উহা নিরাপদ ও

উন্নতি-বর্দ্ধক। অসদ্‌ব্যবহার হইলে উহা বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। সন্তান-ভাবকে অবলম্বন করিয়া চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার নীচবুদ্ধি ও কলুষিত কামনা হইতে মুক্ত রাখাই তোমার আবশ্যক। কিন্তু তুমি যদি সন্তান-ভাবের সুযোগ লইয়া পুরুষদের সহিত অনুচিত ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করিতে শুরু কর, তবে নিশ্চয়ই তাহা পরিণামে তোমার সর্ব্বনাশ-কারকই হইয়া দাঁড়াইবে। সন্তান-ভাব পোষণ করিতেই তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এই সুযোগে বিপজ্জনক ঘনিষ্ঠতা ত' তোমাকে সৃষ্টি করিতে উপদেশ দেওয়া হয় নাই! হা-হুতাশ, গলাগলি, ঢলাঢলি সকল সময়েই অনিষ্টকর, এই কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

প্রঃ– **সন্তান-ভাব ক্রমশঃ বিপজ্জনক পরিণতি লইতেছে কি না, তাহা কি করিয়া বুঝা যাইবে?**

উঃ– কথায় বলে, বাড়াবাড়ি ভাল নয়। সন্তান-ভাব যখন তোমাকে বাড়াবাড়ির দিকে ঠেলিয়া নিতে শুরু করিবে, তখনই সাবধান হইবে। মায়ের স্নেহে কৃত্রিমতাও থাকে না, গোপনতাও থাকে না। কিন্তু সন্তান-ভাব নাম ধরিয়া যখন পাপবুদ্ধি চিত্ত-দুয়ারে উকিঝুঁকি মারিতে শুরু করে, তখন উহাতে স্বাভাবিকতা কমিয়া যায়, কৃত্রিমতা বাড়িয়া যায়, গোপনতার প্রবণতা আস্তে আস্তে আসিতে থাকে। রমণী মাত্রেরই সন্তান-স্নেহ একটা স্বাভাবিক সম্পত্তি। কিন্তু সন্তান-স্নেহ প্রদর্শনের ভঙ্গীটা যখন এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, যে ভঙ্গীতে তুমি নিশ্চিতই তোমার জঠর-জাত সন্তানকে আদর প্রদর্শন করিতে পারিতে না, ঠিক সেই ভঙ্গীতে সন্তান-নামধারী পুরুষটিকে আদর করিতে তোমার ইচ্ছা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, ভুল পথে পাদবিক্ষেপ হইতেছে। প্রেমিক-

প্রেমিকা যে ভাবে পারস্পরিক প্রণয়-ভাব জ্ঞাপন করে, মাতা-পুত্রের স্নেহ-প্রীতির আদান-প্রদানে সেইরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা করা সঙ্গত নয়। কিন্তু যখন দেখিবে যে, মুখে সম্পর্কটা মাতা-পুত্র থাকিলেও, এই মাতার আর এই পুত্রের পারস্পরিক স্নেহ-প্রীতির অনুশীলন ব্যাপারটুকু প্রকাশ্য দিবালোকে ভয় করিতে শুরু করিয়াছে, লোক-লোচনের বাহিরে থাকিয়া ক্রমে বিবর্দ্ধিত হইতে প্ররোচনা অনুভব করিতেছে, একদিকে হা-হুতাশ অপর দিকে অতিরিক্ত মাখামাখির প্রশয় দিতেছে, পরিহাস বা রসিকতার আবরণের মধ্য দিয়া পরস্পরের ব্যক্তিগত জীবনের সভ্যজনসম্মত গোপনতাকে উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, এখন পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ-সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। মাতা-পুত্রের পবিত্র ভাব প্রকৃত প্রস্তাবে দেব-ভাব। সত্য, সরলতা, সংযম, সদাচার, সুজনতা দেব-ভাবেরই পরিপোষক ও পরিপোষিত। মাতা-পুত্রের পবিত্র ভাব তোমাদিগকে নিখিল বিশ্বের প্রতি অধিকতর প্রেমশীল করিতেছে, না ক্রমশঃ ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর ভিতরে আনিয়া শক্ত খুঁটিতে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে ? ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই বুঝিতে সমর্থ হইবে যে, অতি মহৎ বস্তুর নীচ ব্যবহারে উদ্যত হইয়াছ কিনা। পাপ যখন সন্তান-ভাবের ছলনায় আসিয়া স্নেহাতুরা রমণীকে মুগ্ধ করে, তখন সে হয় অতি ভয়ঙ্কর বস্তু। ইহা স্মরণ রাখা প্রত্যেক রমণীরই কর্ত্তব্য।

প্রঃ– অপরিপক্ক-বুদ্ধি বালবিধবা যাহাতে প্রলোভন-বশে কখনও বিপথ-পরিচালিতা হইয়া না পড়ে, তাহার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক ?

উঃ– প্রথমত তাহাকে বৃথা লোক সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গীর অভাবে যদি তাহার মন নিরানন্দ অন্ধকারে আচ্ছন্ন

হইয়া যায় ? তাই তাহার জন্য গৃহেই নানাবিধ নির্দ্দোষ আনন্দের সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহার দেহে-মনে ভগবৎ সাধনের আনন্দ আনিতে হইবে, সৎশিক্ষার গুণে তাহার চিন্তার মধ্যে সাত্ত্বিকী উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইবে। তাহাকে সংসারের কুটিলতা, দৈহিক সুখের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং অসংযমের ভয়ঙ্কর পরিণামের বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া সতর্ক করিতে হইবে এবং নিজের শক্তিতেই সে যাহাতে সকল মানসিক দুর্ব্বলতা বিমর্দিত করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পবিত্রতা রক্ষা করিতে যত্নবতী হয়, তজ্জন্য তাহাকে নিরন্তর উৎসাহ দান করিতে হইবে। নানা যুগের ও নানা স্থানের পুণ্যময়ী ব্রহ্মচারিণীরা কিভাবে জীবন যাপন করিয়া জগতে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন, রমণী-ললাম-ভূতা তেজস্বিনী মহিলারা শত প্রলোভন, নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়াও কি প্রকারে জীবনের শুভ্রতাকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই সকল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহার বুকে বল দিতে হইবে, তাহার হৃদয়ে সৎসাহস জাগাইতে হইবে।

প্রঃ— কোনও ব্রহ্মচারিণী বিধবা যদি ভ্রষ্টচরিত্রা নারীকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ইহাতে ব্রহ্মচারিণীর কি কোনও বিপদের আশঙ্কা আছে ?

উঃ— স্থলবিশেষে আছে। নিজে সম্পূর্ণরূপে সংযত-চরিত্রা ও সাধন-বলসম্পন্না না হইয়া যাহারা অপরের চরিত্রের উন্নতি-সাধনে চেষ্টা করিতে যায়, অনেক সময় তাহাদের নিজেদেরই সংযম হানি ও চরিত্র-চ্যুতি ঘটে। এই জন্য সর্ব্বাগ্রে শক্তি সঞ্চয় করা আবশ্যক। পরোপকার করিবার পূর্ব্বে আত্মগঠন চাই। যাহাকে সৎপথে আনিতে গেলে উল্টা বরং তোমারই বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহার জন্য কোনও প্রকাশ্য চেষ্টা আপাততঃ নাই বা করিলে। কিন্তু

মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিও,–"হে প্রভো ! এই হতভাগিনী জানে না, কোন পাপপঙ্কে সে নিমজ্জিতা হইতেছে ; তুমি নিজ কৃপা-গুণে ইহাকে উদ্ধার কর।"

প্রঃ– সমাজের চক্ষে ধূলি দিয়া যে বিধবা গোপনে গোপনে অসদাচারে আসক্ত হইয়া সংযম-ভ্রষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেকি পুনরায় সৎপথে ফিরিয়া আসিতে পারে ?

উঃ– নিশ্চয়ই পারে। ভগবানের সুপবিত্র নামের আশ্রয় লইলে মানুষ সব পারে। যে মন নিয়ত ইন্দ্রিয়-সুখের পথে বিচরণ করিতেছে, ভগবানের নামের বলে সে মনই নিত্য-পবিত্রতায় অবস্থান করিতে পারে। রিপুর উত্তেজনা ও কুবুদ্ধির প্ররোচনা হইতে প্রাণ বাঁচাইবার ব্রহ্মাস্ত্র হইতেছে– ভগবানের নাম। নামের শক্তিতে যে বিশ্বাস করে, নামের যে শরণাপন্ন হয়, অকপট চিত্তে যে নামের সেবা করে, তার অসৎ সঙ্কল্প দুরে যায়, কুবুদ্ধি তিরোহিত হয়, কুমতি অন্তর্ধান করে, তার সৎসঙ্কল্প দিনের পর দিন দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়। ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষায় যাহার মন নিয়ত দুর্ব্বল, নিয়ত চঞ্চল, নামের বলে সে অপূর্ব্ব সামর্থ্য ও ধীরতা লাভ করে, নামের বলে সে অনায়াসে রিপুজয় করে, নামের বলে তাহার মধ্যে বিবেক-বৈরাগ্য জাগ্রত হয়, নামের বলে সে প্রণষ্ট সংযম-শক্তিকে ফিরিয়া পায়। সঙ্গোপনে পবিত্রতায় জলাঞ্জলি দিয়া যে প্রকৃতই অনুতপ্ত হইয়াছ, সে আজ ভগবানের নামকে পরমসম্বল বলিয়া হৃদয়ে ধারণ কর। হেলায় সতীত্বরতন হারাইয়া যে অভাগিনী চখের জলে বুক ভাসাইয়াছ, সে ভগবানের নামকে ভবসমুদ্রের তরণী বলিয়া গ্রহণ কর। বুঝিবার ভুলে, বুদ্ধির দোষে জীবনের মধ্যে কদর্য্য পঙ্কিলতাকে যদি কখনও ঠাঁই দিয়া থাক, তবু তার জন্য

একেবারে হতাশ হইয়া যাইও না, ভগবানের নামকে সম্বল কর, নামের বলে অন্তরের কালিমা ঘুচিবে। শয়তানের ক্রীতদাসীত্ব করিয়া যদি কখনও অন্তর জুড়িয়া অসহনীয় মর্ম্মদাহ ও মনস্তাপ সংগ্রহ করিয়া থাক, তবু নিরাশ হইও না,–ভগবানের নামের আশ্রয় লও, রিপুভয়ে অভয় পাইবে, কাম-জ্বালার শান্তি হইবে, অপরিমেয় অব্যক্ত দুঃখের তীব্র দাবানল নিবিয়া যাইবে। নারী-সুলভ সরলতার বশে বিষকে অমৃত ভাবিয়া যদি পান করিয়া থাক, আর তাহার সহনাতীত যন্ত্রণায় অধীর অস্থির হইয়া থাক, তবু নিরুৎসাহ হইও না, নামকে অবলম্বন কর, নামের দ্বারা সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, নামের মহিমায় সকল দুঃখকে দূর কর। অসংযমের অভ্যাস, যদি তোমাকে কলুর ঘানির বলদের মত নাকা-দড়ি দিয়া কুপথে ঘুরাইয়া শ্রান্তা, ক্লান্তা ও অবসন্না করিয়া থাকে, ভোগাসক্তি ও ইন্দ্রিয়লিপ্সা যদি তোমাকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা করিয়া মৃত্যুর পথে উল্কা-বেগেও পরিচালিতা করিয়া থাকে, তবু তুমি আশা হারাইও না, তবু ভরসা ছাড়িও না,–প্রাণপণ বলে তুমি ভগবানের পরমপবিত্রতাময় মহানাম বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাক। দেখিবে, ঝটিকাক্ষিপ্ত অনন্ত মহাসমুদ্রের ক্রুদ্ধ-তরঙ্গ-সমাকুল রুদ্রমূর্ত্তি শীঘ্রই শান্ত হইবে, অকূলে তুমি কূল পাইবে। তোমার চিত্ত যদি এমন জড়দশাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে যে, পাপ করিলে অনুতাপ আসে না, অপরাধ করিতে প্রাণে কুণ্ঠা জাগে না, অসৎ পথে চলিতে গেলে ভিতর হইতে বিবেকের নিষেধ-বাণী গর্জ্জন করে না, তথাপি নিরাশ হইও না, তথাপি হাল ছাড়িয়া দিও না, একাগ্র মনে নাম করিতে থাক, নামের বাতাসে মন-নৌকার পাল তুলিয়া দাও, আপনি

কঠিন হৃদয় কোমল হইবে, কঠোর চিত্ত অশ্রুধারায় গলিয়া পড়িবে, অনুতপ্ত মনে অনুতাপের হাহাকার জাগিয়া উঠিবে, ইন্দ্রিয়াসক্তিতে বিরাগ জন্মিবে, বিবেক তাহার মোহনোজ্জ্বল মূরতি ধরিয়া অপরূপ বেশে সুস্মিত হাসিতে জগৎ আলো করিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইবে, তোমাকে ক্রোড় দিবে, তোমাকে বুকে টানিয়া ধরিবে, তোমাকে পাপ-মুক্তির পথ, পবিত্রতার পথ দেখাইয়া দিবে। বন্ধুরূপী কোনও পরমশত্রু যদি তোমার প্রতি কপট ভালবাসা জানাইয়া তোমার দুর্ব্বল চিত্তকে বশীভূত করিয়া থাকে, আর যদি তোমার সকল আত্মরক্ষার শক্তিও মোহবশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়া থাকে, তথাপি তুমি হতাশায় ঢলিয়া পড়িও না,—নাম কর আর প্রাণপণ শক্তিতে ভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণ কর, দেখিও, কামমোহের ভীষণ নাগপাশ খুলিয়া যাইবে, ফাঁসীর দড়ি ছিঁড়িয়া যাইবে, তোমার দুর্ব্বল মনে সবলতার সঞ্চার হইবে, তোমার পরাধীন চিত্তবৃত্তি স্বাধীনতার দীপ্ত আলোকে উন্নত শিরে দাঁড়াইবে, তোমার পায়ের শৃঙ্খল শতধা ছিন্ন হইবে, তোমার পক্ষাঘাতাক্রান্ত চরণ-যুগলে চলিবার ক্ষমতা আসিবে, কপটী লম্পটের ললাটের উপরে শত পদাঘাত অঙ্কিত করিয়া সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে, সতীত্বের পথে অগ্রসর হইবার মনোবল তুমি পাইবে। নামই পতিতের উত্থানের মূলমন্ত্র, নামই দুষ্কৃতির উপশমের পরমমহৌষধ্— নামে নিষ্ঠাবতী হও।

প্রঃ— বিধবার সাধন ভজনে কি কি বিশেষত্ব আছে ?

উঃ— বিধবারা ব্রহ্মচারিণী, সুতরাং যে সকল সাধনে ব্রহ্মচারীদের অধিকার, বিধবাদেরও তাহাতে পূর্ণ অধিকার। বিধবার সাধন-ভজনের বিশেষত্ব এই যে, যাহা ইন্দ্রিয়-সংযমের নাশক, সেই সকল সাধন-প্রণালী তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যাজ্য।

প্রঃ– বিধবা কি ব্রহ্মগায়ত্রী ✳ ও প্রণব (ওঁ) মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে ?

উঃ– পারে। সাধন করিবার ইচ্ছা যার আছে, সে স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, সধবা হউক, বিধবা হউক, অতীতেও ব্রহ্মগায়ত্রীতে তার পূর্ণ অধিকার ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও চিরকাল ধরিয়া থাকিবে।

প্রঃ– বিধবা কি প্রাণায়াম করিতে পারে ?

উঃ– সাধন-ভজনের এমন নিগূঢ় কৌশল নাই, যাহা হইতে ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। প্রাণায়ামও একটি সাধন-কৌশল মাত্র। যে কৌশল অবলম্বন করিলে শ্বাস-বায়ুর চঞ্চলতা কমিতে থাকে, তাকেই বলে প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের বহুবিধ প্রণালী আছে। কোনও প্রণালী বিপজ্জনক, কোনও প্রণালী নিরাপদ। নিরাপদ প্রণালীসমূহের মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাসের ও স্বাভাবিক প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্বাসে আর প্রশ্বাসে নাম জপ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ইহা বহুদিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্বাসের চঞ্চলতা আপনিই কমিতে থাকে এবং প্রাণবায়ু হয় ভিতরে, নয় বাহিরে সুস্থির হয়। দুই এক মাসের চেষ্টাতেই ইহা হয় না, ইহা হইতে কাহারও দুই এক বৎসর, কাহারও দশ বিশ বৎসরও লাগিয়া যায়। হৃদয়ের অনুরাগ এবং সাধনের নিষ্ঠার উপরেই সিদ্ধির

✳ ব্রহ্মগায়ত্রীর ব্যাখ্যার জন্য বালকদের জন্য লিখিত "সরল - ব্রহ্মচর্য্য" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মগায়ত্রী ওঁ ভূ র্ভু বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

দ্রুততা বা বিলম্ব নির্ভর করে। কিন্তু যদিও অতি আস্তে আস্তে এই প্রণালীতে সিদ্ধি আয়ত্ত হয়, তথাপি ইহা সর্ব্বপ্রকার নিরাপদ বলিয়াই ইহা নির্বিচারে সকলের গ্রহণীয় ও অভ্যাস্য।

প্রঃ– নাম শ্রেষ্ঠ, না প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ ?

উঃ– অর্থাৎ ক্ষুধা-বিদূরণের জন্য অন্ন শ্রেষ্ঠ, না, ব্যঞ্জন শ্রেষ্ঠ ? রুটি শ্রেষ্ঠ না, ডাল শ্রেষ্ঠ ? তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য জল শ্রেষ্ঠ, না সেই জলকে সুখসেব্য করিবার জন্য যে শর্করা মিশ্রিত করা হইয়াছে, তাহা শ্রেষ্ঠ। ইহাই তোমার প্রশ্ন। তাহার জবাব এই যে, নামই আদিতে শ্রেষ্ঠ, নামই মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নামই অন্তে শ্রেষ্ঠ। প্রাণায়াম, স্তোত্র পাঠ, কীর্ত্তন, শাস্ত্রাধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ, তীর্থবাস প্রভৃতি সব কিছুই নামকে মুখরোচক করিবার জন্য।

প্রঃ– দেহের সসীম ইন্দ্রিয় দিয়া কি অসীম ভগবানের প্রেম-সম্ভোগ করা যায় ?

উঃ– না, তাহা যায় না। এই জন্যই সসীম ইন্দ্রিয়ের সংযম আবশ্যক। তাহার ফলে তোমার মধ্যে যে সকল অসীম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে, তাহা ফুটিয়া উঠিবে এবং তখন অসীম ভগবানের অসীম প্রেমরসের আস্বাদনের তুমি অধিকার পাইবে।

প্রঃ– বিধবার জীবনের লক্ষ্য কি ?

উঃ– ভগবদ্দর্শন লাভ করাই বিধবার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

প্রঃ– ভগবদ্দর্শনের উপায় কি ?

উঃ– চিত্তশুদ্ধি, ব্রহ্মচর্য্য ও নিয়ত নাম-সাধন এবং নিষ্কাম হৃদয়ে জীব-সেবা।

প্রঃ– কেহ কখনও ভগবানকে প্রকৃতই দর্শন করিয়াছেন কি ?

উঃ– সহস্রে সহস্রে করিয়াছেন ও করিতেছেন। সাধন কর, তুমিও

ভগবদ্দর্শন করিবে। তুমি সহায়-সম্বলহীন বলিয়া ভগবদ্দর্শনে বাধা হইবে না। তুমি অনাথা, অবলা বলিয়া ভগবান্ তোমাকে কৃপা করিতে কার্পণ্য করিবেন না। প্রাণপণে তাঁহাকে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে থাক, নিশ্চিতই তিনি তোমার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া তোমার মনোমোহন রূপ ধরিয়া আবির্ভূত হইবেন।

প্রঃ– কি ভাবে ভগবানকে ডাকিতে হয় ?

উঃ– সুখের সময়ে তাঁহাকে ডাক, দুঃখের সময়ে তাঁহাকে ডাক, সম্পদের সময়ে তাঁহাকে ডাক, বিপদের সময়ে তাঁহাকে ডাক। তাঁহাকে ডাক মন খুলিয়া, প্রাণ খুলিয়া, হৃদয় খুলিয়া, তাঁহাকে ডাক অকপট হইয়া, নিঃসঙ্কোচ হইয়া, নির্ভয় হইয়া। শত শত নাম ধরিয়া, শত শত প্রণালী ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিও না, তাঁহাকে ডাকিবে একটী নির্দ্দিষ্ট নামে, একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে। যে নাম ধরিয়া অহর্নিশ তাঁহাকে মনে মনে ডাকিবে, সযত্নে তাহা বুকের মধ্যে গোপন রাখিয়া চলিবে, আর কেহ যেন তাহা না জানিতে পারে। ভগবানের নাম বড় সঙ্গোপনের ধন।

সম্পূর্ণ